সাধু গ্রেগরির দিনগুলি

শাহরিয়ার কবির

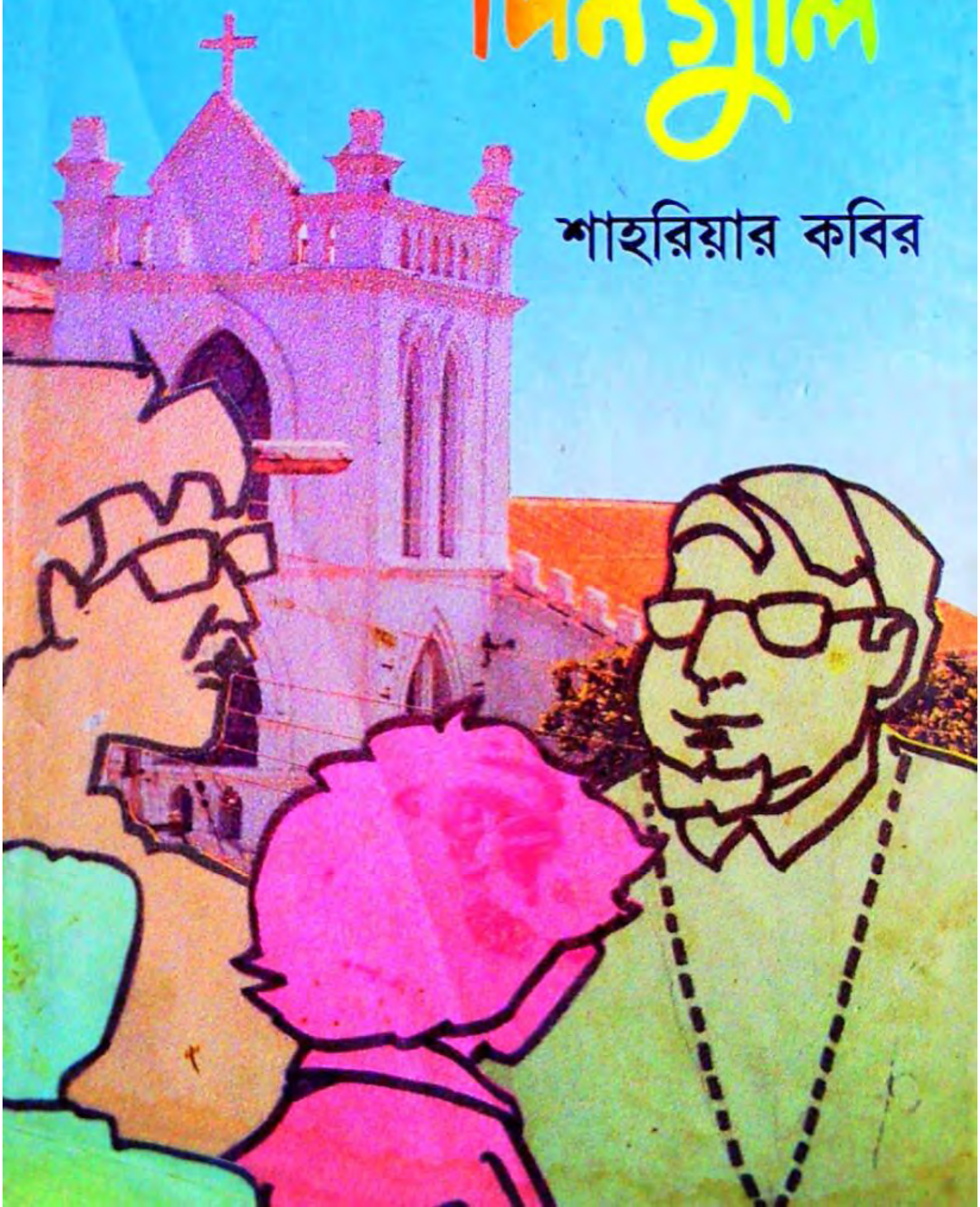

সাধু গ্রেগরির দিনগুলি

সাধু গ্রেগরির দিনগুলি

শাহরিয়ার কবির

দিব্য প্রকাশ

দিব্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

প্রকাশক
মঈনুল আহসান সাবের
দিব্য প্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মাসুক হেলাল

মূল্য
৫০ টাকা মাত্র

Sadhu Gregoryr Dingulee Memoirs of school days by Shahriar Kabir.
Published by Dibbyo Prokash, 38/2ka Banglabazar, Dhaka 1100.
Cover designed by Masuk Helal.
First published: February, 1994.
Price Taka Fifty only.

ছোট্ট বন্ধুরা

আমার বহু গল্প উপন্যাসে আমাদের স্কুলের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। শিক্ষকদের কথা বলেছি, ছাত্রদের কথাও বলেছি, গল্প উপন্যাসের প্রয়োজনে অনেক সময় তাঁদের আসল নাম গোপন করতে হয়েছে। কোন পরিস্থিতিতে এসব গল্প উপন্যাসের জন্ম হয়েছিলো, আমি নিজেই বা কিভাবে তৈরি হয়েছি— সে সব বলার জন্য *সাধু গ্রেগরির দিনগুলি* লেখা হলো। লিখতে গিয়ে বার বার রোমাঞ্চিত হয়েছি আমি।

আমাদের স্কুল থেকে যারা পাস করে বেরোয় তারা কখনওই ভুলতে পারে না সেই আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা। কোথায় না আছে তারা? দেশের কথা বাদই দিলাম, যখন রোমে এক অচেনা মধ্যবয়স্ক বাঙালী ব্যবসায়ীকে বলতে শুনি তিনি গ্রেগরিয়ান, প্যারিসে আমাদের রাষ্ট্রদূতের পার্টিতে দূতাবাসের তরুণ কূটনীতিক বলেন তিনি গ্রেগরিয়ান, ফ্র্যাংকফুর্ট-এ রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণকারী এক যুবককে বলতে শুনি সে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে পড়েছে কিংবা ভার্জিনিয়াতে বাঙালিদের এক পার্টিতে দু'জন গ্রেগরিয়ানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তখন মনে হয় শতায়ু এই বৃদ্ধ শিক্ষালয়ের সন্তানরা পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত আছে যেখানে ছড়িয়ে নেই? অহংকারও কি কারও কম! দশ পনেরো কুড়ি বছরের সিনিয়র হোক কিংবা জুনিয়র হোক, যখনই আবিষ্কার হয়— 'তুমি গ্রেগরিয়ান!' —তখন বয়স, মর্যাদা, বিত্ত আর খ্যাতির সকল ব্যবধান মুছে গিয়ে একটাই পরিচয় বড় হয়ে ওঠে— আমরা গ্রেগরিয়ান।

শা. ক.

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

প্রকৃতির পাঠশালায়

আমার বয়স যখন চার তখন আমাকে একবার স্কুলে ভর্তি করানোর চেষ্টা হয়েছিলো। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি। ঢাকায় হাতে গোনা যে ক'টা স্কুল ছিলো, ভর্তির কোনো কড়াকড়িই সেখানে ছিলো না। চেষ্টা করেও আমাকে ভর্তি করানো যায়নি, কারণ স্কুল আমার পছন্দ হয়নি।

আমরা তখন থাকতাম তেজগাঁয়। শুধু নামে নয় আসলেই পাড়াগাঁ ছিলো। এখন যেখানে গ্রীন সুপার মার্কেট তার উল্টোদিকে হামিদুল হক চৌধুরীর চমৎকার একটা বাগানবাড়ি ছিলো। পঞ্চাশ বিঘা জমির ওপর ছবির মতো একটা বাংলো, পাশে শান বাঁধানো পুকুর, লিচু বাগান, আম বাগান, কাঁঠাল বাগান ছাড়াও রকমারি ফলের গাছ ছিলো। বাগানের শেষ প্রান্তে নিচু ধান ক্ষেত। তারপর খাল। এত বড় বাগান বাড়িতে বাবা, মা, আমরা তিন ভাই আর কাজের লোকরা ছাড়া অন্য কেউ থাকতো না।

এর আগে থাকতাম পুরোনো ঢাকার ইসলামপুরে নবরায় লেনের সরু গলিতে। গলি সরু হলেও দোতালা বাড়িটা অনেক বড় ছিলো। আমার আর ছোট ভাইয়ের জন্ম হয়েছিলো সেই বাড়িতে। ছোট ভাই হওয়ার পর মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার বললেন, হাওয়া বদলাতে হবে। মাটির কাছাকাছি থাকতে হবে।

নবরায় লেনের বাড়ির ত্রিসীমানায় মাটি ছিলো না। বড় একটা উঠোন ছিলো, আগাগোড়া পাকা। পুরোনো ঢাকা তখন থেকেই ঘিঞ্জি শহর। মা'র অসুখের কথা শুনে তাঁর মামা হামিদুল হক চৌধুরী, তিনি বোধহয় তখন পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন, নাকি আরও পরে হয়েছেন— মনে নেই, বাবাকে বললেন, মাকে নিয়ে তাঁর তেজগাঁর বাগানবাড়িতে থাকতে।

বাবার অফিস ওয়াইজ ঘাটে, ভাইয়া পড়ে লক্ষী বাজারের সেন্ট গ্রেগরিজে, কোনোটাই নবরায় লেন থেকে দূরে নয়। তেজগাঁ মানে তো অনেক দূর! রমনার

ঘোড়দৌড়ের মাঠের পর ফাঁকা ফাঁকা একটা দুটো বাড়ি, তারপর কাওরান বাজারের ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে তেজগাঁ এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। শহর থেকে যত দূরই হোক যেতে হবে। ঠিক হলো ভাইয়াকে অফিসে আসার সময় বাবা স্কুলে পৌঁছে দেবেন। স্কুল ছুটির পর ভাইয়া বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরবে।

তেজগাঁয় বাগান বাড়িতে যখন আমরা যাই তখন আমার বয়স ছিলো সাড়ে তিন বছর, ছোট ভাইর বয়স ছ মাস। ভাইয়া আমার ছ' বছরের বড়, আর বাবার বয়স তেতাল্লিশ। ছোটবেলার অনেক কথা মনের পর্দায় এমনভাবে ছাপ ফেলেছে— এখনও সেসব পরিষ্কার দেখতে পাই। তেজগাঁ কেন, নবরায় লেনের বাড়ির কথাও আমার পষ্ট মনে আছে। ছোট ভাই হওয়ার পর মা যখন ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তখন কে যেন বলেছিলো, 'তোমার ভাইকে দেখবে না?' মা'র ঘরে গিয়ে দেখি উঁচু খাটে তিনি শুয়ে আছেন। আমার চেয়ে উঁচু ছিলো খাটটা। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে মাথা তুলে দেখি মা'র বুকের কাছে লালচে একটা জ্যান্ত পুতুল ক্ষুদে ক্ষুদে হাত পা নাড়ছে। নবরায় লেনের বাড়িটা ছিলো ইংরেজি 'এল'–এর মতো। উঠোন থেকে যে সিড়িটা দোতালা পর্যন্ত উঠেছে, সেটাও 'এল' এর মতো। সে বাড়ি আর এখন নেই।

ইসলামপুর থেকে তেজগাঁর বাড়িতে এসেছিলাম ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। ঢাকা তখন দুই ঘোড়ায় টানা পাল্কির মতো ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই ছিলো। রিকশাও ছিলো, তবে দূরে যেতে হলে ঘোড়ার গাড়িতে যেতাম। পাকা রাস্তার ওপর ঘোড়ার নাল বাঁধানো পায়ের খট খট শব্দ, চাকার ঘড়ঘড় শব্দ, ভেতরে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ, খড়খড়িওয়ালা জানালা তুলে বাইরের দোকানপাট আর ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে নবাবপুরের উঁচু পুল পেরিয়ে, ফুলবাড়িয়া রেলক্রসিং পেরিয়ে, গাছ গাছালিতে ঢাকা রমনার ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে দিয়ে, কাওরান বাজার হয়ে এক বিকেলে এসে নেমেছিলাম তেজগাঁর বাগানবাড়িতে।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার পাকা রাস্তা থেকে বাঁয়ে কিছুটা কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে বাঁ হাতে ঢুকতে হয়েছিলো বাগানবাড়ির সীমানায়। ভেতরে ঢুকে সুরকি বিছানো সরু রাস্তা ধরে কিছু দূর এগুলে ডানহাতে পুকুর। চওড়া বাঁধানো ঘাট, ঘাটের ওপরে হেলান দিয়ে বসার জায়গাও লাল সিমেন্টে বাঁধানো। তারপর উঁচু টিনের আটচালা বাঙলো। দেয়াল আর মেঝে পাকা। চারদিকে চওড়া ঘেরা বারান্দা, সামনে পেছনে সিড়ি, পেছনের সিড়ির পাশে মস্ত বড় গন্ধরাজ ফুলের গাছ। গন্ধরাজের গাছ কখনও এতো বড় হতে পারে আর কোথাও দেখিনি।

আমার আর ছোট ভাইয়ের দেখাশোনা করতো কোনো আয়া নয়, দশাসই চেহারার এক লোক। ওর নাম ভুলে গেছি, তবে এটা পষ্ট মনে আছে, ওর হাতে ছয়টা আঙ্গুল ছিলো। আমাকে ও ডাকতো 'মাইজা মিয়া,' আর ছোট ভাইকে ডাকতো 'কুট্টি মিয়া।' ছোট ভাই বাবলুকে কোলে নিয়ে আমার হাত ধরে ও বাগানে ঘুরে বেড়াতো, নানা রকম গাছ আর পাখি চেনাতো। গাছ ভর্তি কামরাঙা, সবেদা, বিলিতি গাব, জামরুল এসব দেখে দিন কাটতো। কখনও ও কোথেকে বৈঁচি ফল কুড়িয়ে আনতো, তারপর

মালা গেঁথে গলায় পড়িয়ে দিতো। ক্ষুদে ক্ষুদে সেই বৈঁচি ফলের চমৎকার স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে।

কখনও একটা ছড়ি হাতে একা বেরিয়ে পড়তাম, লজ্জাবতী গাছের ঝোপ খুঁজে ছড়ি দিয়ে মারতাম। সামান্য আঘাত পেলেই পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে বুজে যেতো। ছোট ছোট হালকা বেগুনি ফুল হতো সেসব গাছে।

সারা বাগান জুড়ে ছিলো বাদুড়ের প্রচন্ড উৎপাত। রাত হলেই গাছে গাছে বাদুড়ের ডানার ঝটপট শব্দ। ছয় আঙ্গুলে 'হুই, হুই' বলে বাদুড় তাড়াতো আর সকাল বেলায় দুঃখ করতো—পাকা ফলগুলো সব বাদুড়ে খেয়ে ফেলেছে। লিচুর সময় বাদুড়দের একটু অসুবিধে হতো। লিচুতে যখন রঙ ধরতো, মালিরা সব গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিতো। কোনো কোনো দিন জালে বাদুড় আটকে থাকতো।

বাগানবাড়িতে ইলেকট্রিকের লাইন ছিলো না। রাত হলে ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বালানো হতো, বারান্দায়ও হারিকেন ঝোলানো থাকতো। বাবা আর ভাইয়ার ফিরতে ফিরতে প্রায়ই অন্ধকার হয়ে যেতো। পাটুয়াটুলিতে ইন্সটিটিউট অব কমার্স নামে বাবা একটা সেক্রেটারিয়েল কোর্সের কলেজ খুলেছিলেন, কলকাতা থেকে ঢাকা আসার পরই। অফিস ছুটির পর তিন চার ঘন্টা সেখানে কাটাতেন তিনি। ভাইয়াও থাকতো সঙ্গে। বাড়ি ফিরতে তাই রাত হতো।

অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে শুরু হতো ঝিঁঝি পোকার ডাক, তারপর ডাকতো শেয়াল। গোটা বাগান বাড়িতে ছিলো শেয়ালের ছড়াছড়ি। একটা 'হুক্কা হুয়া' ডাকলো, আর অমনি চারদিক থেকে 'হুয়া হুয়া, কেয়া হুয়া' বলে অন্য শেয়ালরা কোরাসে গলা মেলাতো। আমাদের ছয় আঙ্গুলের তখন একমাত্র কাজ ছিলো আমাকে গল্প শোনানো। কখনও বাবার ফিরতে যদি রাত বেশি হতো, মালিরা পুকুর ঘাটে বসে গল্প করতো, বাড়ির চারপাশে ঘুরে টহল দিতো আর মাকে বলতো, 'বিবি সাব, আমরা সজাগ আছি। ভয়ের কিছু নাই।'

শেয়াল ছাড়াও বাগান বাড়িতে বনবেড়াল ছিলো, ভোঁদড় ছিলো, বেজি ছিলো, সাপ তো ছিলোই, আর ছিলো অনেক কাঠ বেড়ালি। একবার বাড়ির পেছনের গন্ধরাজ গাছের গোড়ায় সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা গিয়েছিলো। তার পরদিনই মা মালিদের বললেন গাছটা কেটে ফেলতে। বুড়ো গন্ধরাজ গাছটা শেকড় সমেত উপড়ে তোলায় পর দেখা গেলো গোড়ায় গর্তের ভেতর সাদা সাদা সাতটা সাপের ডিম। মালিদের মুখ শুকিয়ে চুন, নাকি সাপ এর প্রতিশোধ নেবে। বাবা কোথেকে কার্বলিক এসিড এনে বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন। আমি জানলাম কার্বলিক এসিডের গন্ধ থেকে সাপ দূরে থাকে। প্রকৃতির পাঠশালায় আমার পড়াশোনা এই বাগানবাড়ি থেকেই শুরু হয়েছিলো।

একবার শেয়ালের উৎপাত এত বেড়ে গেলো যে, মুরগির খোয়াড় থেকে সমানে মুরগি খোয়া যেতে লাগলো। গভীর রাতে হঠাৎ শোনা যেতো মুরগিদের ভয়ার্ত ডাক আর ডানার ঝটপটানি। লোকজন ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই শেয়াল মুরগি নিয়ে পগার পার।

পর পর কয়েক রাতে এরকম হওয়ার পর শেয়ালমারাদের খবর দেয়া হলো। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি শেয়াল মারা হবে, কাজের লোকেরা রীতিমতো উত্তেজিত। সবার সঙ্গে আমিও শেয়াল মারা দেখতে যাবো বায়না ধরতেই মার বকুনি খেতে হলো। তাড়া খাওয়া শেয়াল নাকি খুব হিংস্র হয়, ছোট ছেলেদের গলার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে।

ছয় আঙ্গুলে আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পুকুর ঘাটে গেলো। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বিরাট লিচু বাগান। শেয়ালমারার দল সেখানে কয়েকটা গর্ত খুঁজে পেয়েছে। ছয় আঙ্গুলে আমার কৌতূহল মেটানোর জন্য বললো, অন্য সব গর্তের মুখে আগুন ধরিয়ে দিয়ে শেয়ালমারারা একটা গর্তের মুখে লাঠি আর জাল হাতে বসে থাকবে। আগুনের ধোঁয়া গর্তের ভেতরে গেলে শেয়ালরা গর্তের সেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

সেবার অনেক সময় লেগেছিলো গর্ত থেকে শেয়াল বের করতে। বিকেলের দিকে শেয়ালমারারা তিনটা শেয়াল মেরে দুটোকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে গেলো। নাকি শেয়ালের তেল থেকে বাতের ওষুধ বানানো হবে। কাছে থেকে জ্যান্ত শেয়াল সবারই প্রথম দেখলাম। মোটেই হিংস্র মনে হলো না ওগুলোকে। কেমন করুণ চোখে তাকাচ্ছিলো। ইচ্ছা হলো ধরে আদর করি। ছয় আঙ্গুলে আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে রাখলো— 'ধরলেই কামড় দিবো', বলে।

সবাই বললো এরপর আর মুরগির খোয়াড়ে কোনো ঝামেলা হবে না। কয়েকদিন নিরাপদেই কাটলো। তারপর আবার হামলা হলো খোয়াড়ে। শেয়াল মারার পর থেকে বাগানবাড়িতে রাতে কেউ শেয়ালের ডাক শোনেনি। ডাক যা শোনা যেতো—অনেক দূরে। সবাই বললো, এটা শেয়ালের কাজ নয়, অন্য কিছু হবে। কাজের লোকেরা এক রাতে পাহারা বসালো, ফাঁদ পাতলো। পরদিন সকালে ফাঁদে ধরা পড়লো মস্ত এক বনবেড়াল। কুকুরের সমান দেখতে, ধুসর রঙের লোমে ঢাকা শরীর, চিতার মতো ওপরে ফোটা ফোটা দাগ। দড়ি দিয়ে গলায় বাঁধা হয়েছিলো শক্ত করে। কী ভীষণ রাগ তার! ফ্যাচ ফ্যাচ করে গজরাচ্ছিলো আর ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে গলার দড়ি ছিঁড়ে ফেলতে চাইছিলো। খবর পেয়ে এক গুণিন এসে ওটা নিয়ে গেলো। বনবেড়ালের লেজ আর নখ দিয়ে কী নাকি বানাবে।

মাঘ ফাল্গুনে আম গাছের মুকুলে সারা বাগান গন্ধে মাতাল হয়ে থাকতো। লিচু বাগানেও ফুল ফুটতো। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিরা আসতো। আম বাগান আর লিচু বাগান ভরে যেতো মৌচাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে আসতো মৌয়ালরা। প্রথমে ওরা ঘুরে ঘুরে দেখতো। কোন মৌচাকের কোথায় কতটুকু মধু জমেছে। বাইরে থেকে ওরা সব বুঝতে পারতো। সামান্য একটু ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি সরিয়ে চাক থেকে মধুর অংশটুকু কেটে আনতো। দশ বারোটা চাক ভাঙলেই ওদের পেতলের বালতি চাক ভাঙা মধুতে ভরে যেতো। মৌচাক যেমন ছিলো তেমনই থাকতো। অন্য সময় মালিরা চাক ভাঙতে গেলে বেশি ধোঁয়া দিয়ে, চাকে এলোপাথাড়ি খোঁচা মেরে মৌমাছিদের তাড়িয়ে দিতো। মা পারতপক্ষে মালিদের চাক ভাঙতে দিতেন না। মৌয়ালদের চাক ভাঙার দিনক্ষণও

থাকতো। চাক ভাঙার সময়কে তারা বলতো 'অমাবস্যা আর পূর্ণিমার জো।'

এক রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিলো। কাজের লোকদের ভেতর হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। বাবার কাছ থেকে টর্চ নিয়ে সবাই মাছ রাখার বাঁশের খলুই হাতে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর ওরা খলুই ভর্তি কই মাছ এনে রান্নাঘরের মেঝের ওপর উপুড় করে ঢাললো। সারা মেঝে ছোট বড় নানা আকারের কই মাছের দাপানিতে ভরে গেলো। নতুন বৃষ্টির পানি পেয়ে কই মাছ সব ধান ক্ষেত থেকে উঠে এসেছে।

এখন যেখানে সোনারগাঁও হোটেল তার পাশের রাস্তাটা তখনও ছিলো, তবে এত চওড়া ছিলো না। সেই রাস্তার ওপর ছিলো উঁচু এক পুল। পুরো এলাকাটা ছিলো নিচু জলা জমি, পুলটা ছিলো খালের ওপর। বৃষ্টির পর খালের পানিতে স্রোতের টান পড়েছে। সকালে আমাকে আর ছয় আঙ্গুলেকে নিয়ে ভাইয়া সেখানে গেলো মাছ ধরতে।

মাছ ধরা যে এত সহজ আমার জানা ছিলো না। পুলের নিচে খালের হাঁটু পানিতে নেমে ওরা দু'জন একখানা গামছা পানিতে ডুবিয়ে টান টান করে দুই মাথা ধরে থাকলো। একটু পরেই গামছা তোলা হলে দেখা গেলো চকচকে পুটি, খলসে আর ট্যাংরা মাছ সেখানে লাফাচ্ছে। খলুই ভরতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না।

বাগান বাড়িতে আমার দিনগুলো এত আরামে কাটছিলো এটা বোধহয় বাবা মা'র পছন্দ হচ্ছিলো না। ওঁরা ঠিক করলেন আমাকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। তখন আমার বয়স চার হয়েছে। এক সকালে সাজিয়ে গুজিয়ে হাতে একটা খাতা আর পেন্সিল ধরিয়ে দিয়ে বাবা আমাকে নিয়ে চললেন স্কুলে।

প্রথম যে স্কুলে আমাকে আনলেন সেটা বাগান বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। একটা টিনের ঘর, বাঁশের বেড়ার দেয়াল। ঘরের মেঝেও মাটির। নড়বড়ে খান কয়েক লম্বা বেঞ্চ। আমার চেয়ে বড় কয়েকটা ছেলে মলিন মুখে বসে আছে। ডেস্ক বা হাইবেঞ্চ নেই। সবার কোলের ওপর বই খাতা ধরা। বেড়ার গায়ে ঝোলানো ব্ল্যাকবোর্ডে ক্লাস টিচার কিছু লিখছিলেন। বাবা আমাকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে টিচারের সঙ্গে কী যেন কথা বললেন, তারপর বাইরে এসে হাসিমুখে বললেন, 'এটা তোমার স্কুল। পছন্দ হয়?'

'না।' ঘাড় বাঁকা করে আমি জবাব দিলাম।

'না কেন? এটা ভালো স্কুল। এখন থেকে তুমি এই স্কুলে পড়বে।'

'আমি এখানে পড়বো না। এটা ভাঙা স্কুল।'

একপাশের বেড়া খানিকটা ভাঙা ছিলো। ফাঁক দিয়ে ওপাশে একটা ছাগল দেখা যাচ্ছিলো। আমার আচরণে বলাই বাহুল্য বাবা হতাশ হলেন।

বাড়িতে এসে তিনি মাকে বললেন, 'স্কুল ওর পছন্দ হয়নি। এ স্কুলে পড়বে না।'

মা বললেন, 'অন্য স্কুল দেখ।'

এর কিছুদিন পর আবার আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে বাবা চললেন নতুন স্কুলের সন্ধানে। এবার ছয় আঙ্গুলেও এলো আমাদের সঙ্গে। এই স্কুলটা ছিলো পাকা রাস্তার ওপর। দেয়াল পাকা হলেও ওপরে টিনের চাল। যে ক্লাসের সামনে আমাকে দাঁড়

করিয়ে রেখে বাবা ভেতরে ঢুকলেন, সেখানকার ছেলেরাও আমার চেয়ে বড়। আমার দিকে ওদের কেউ কেউ এমন ভাবে তাকাচ্ছিলো— সিদ্ধান্ত নিলাম এখানেও পড়বো না।

বাবা আগের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'এ স্কুল তোমার পছন্দ হয়?'

'না।' আগের মতোই আমার ঘাড় বাঁকানো জবাব।

'না কেন? এটা তো অনেক ভালো স্কুল।' বাবা এবার একটু বিরক্ত হলেন।

'আমি এখানে পড়বো না।'

আমার ঘাড় বাঁকানো স্বভাবের কথা বাবা জানতেন। তাই সেখানে আর কথা না বাড়িয়ে আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। মা শুনে যথারীতি বিরক্ত হলেও কিছু বললেন না।

এমন বেয়াড়া স্বভাব আমার ভেতর কোত্থেকে এলো জানি না। মা মারা যাওয়ার পর মামী আর খালারা বলতেন আমি নাকি মা'র স্বভাব পেয়েছি। একবার ছুটির দিনে বাগান বাড়ির পুকুরে বাবা মা আমাকে নিয়ে নামলেন সাঁতার শেখাবেন বলে। নিচের ঘাটে এক মাথায় বুকসমান পানিতে মা দাঁড়িয়েছেন আরেক মাথায় বাবা। আমি বাবার কোলে। ভাইয়া সারা পুকুর দাপিয়ে সাঁতার কাটছিলো। বাবা আমাকে বললেন কিভাবে হাত পা ছুঁড়তে হয়। আবার বুকের তলায় হাত রেখে পানি ওপর উপুড় করে ধরে বললেন, 'এবার হাত পা নাড়ো।'

বাবার কথা মতো নাড়লাম। কিছুই হলো না। যেই বাবা আমার বুকের নিচ থেকে হাত সরিয়ে নিতে যাবেন তাঁর গলা আঁকড়ে ধরলাম। বাবা বার বার বোঝালেন তাঁকে এভাবে ধরে রাখলে আমার সাঁতার শেখা হবে না। তবু আমি তাঁকে ছাড়ছিলাম না। হঠাৎ বাবা মাকে বললেন, 'ধরো ওকে।' আমাকে জোর করে পানিতে নামিয়ে ঠেলে দিলেন মার দিকে। হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমি ডুবে যেতে লাগলাম। বাবা এসে টেনে তুললেন। ততক্ষণে কয়েক ঢোক পানি আমার পেটে চলে গেছে। আমি তারস্বরে কান্না জুড়ে দিয়েছি। বাবা আমাকে কিনারে এনে ঘাটের ওপর দাঁড় করালেন। বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। দেখছো না তোমার ভাই কেমন সাঁতার কাটছে!' মা ডাকলেন—'ওখান থেকে লাফ দিয়ে আমার কাছে এসো।' আমি বললাম, 'না।' এরপর মা বা দুজনই অনেক খেলনা দেয়ার লোভ দেখালেন। আমার এক কথা–'না।' সেই 'না'–এর জন্য এ জীবনে আর আমার সাঁতার শেখা হলো না।

বাগান বাড়ির দিনগুলো আমার জন্য আনন্দের হলেও বাবা আর ভাইয়ার জন্য খুব কষ্টকর ছিলো। বাবা অফিসে যেতেন সাইকেলে করে। ভাইয়াকে বসাতেন পেছনের ক্যারিয়ারে। যদিও বাবার স্বাস্থ্য ছিলো চমৎকার তবু সন্ধ্যার পর এতটা পথ সাইকেলে আসতে কষ্ট হতো ওঁর। একবার বাড়ি ফেরার পথে শাহবাগের মোড়ে এ্যাকসিডেন্ট হলো। সামনে থেকে আসা একটা ট্রাকের ধাক্কা থেকে বাঁচতে গিয়ে সাইকেল সমেত বাবা পাশের লাইটপোস্টে ধাক্কা খেয়েছিলেন। ভাইয়া ছিটকে পড়েছিলো সাইকেল থেকে। হাত পা ছড়ে গিয়েছিলো বাবাও আঘাত পেয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফেরার পর

দুজনকেই গরম পানির সেঁক দিতে হয়েছিলো।

এই এ্যাকসিডেন্টের পরই ঠিক হলো আমরা শহরে ফিরে যাবো। আমার চার বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছি না পছন্দ হচ্ছে না বলে—শহরে ফেরার এটাও একটা কারণ ছিলো। আর তাছাড়া মার শরীরও ততদিনে সেরে গেছে।

নবরায় লেনের বাড়ি ছিলো ভাড়া করা। সেখানে অন্য ভাড়াটে এসে গেছে। ঢাকায় তখন বাড়ি ভাড়া পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিলো। কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরে বাবার বড় ভাই, আমাদের একমাত্র জেঠু ছোট্ট একটা বাড়ি কিনেছিলেন সূত্রাপুরের রূপচাঁদ লেনে। বাড়ির দখল নিয়ে তখন কী সব গন্ডগোল চলছিলো। জেঠু বাবাকে বললেন রূপচাঁদ লেনের বাড়িতে এসে থাকতে।

বাগানবাড়ির পাট চুকিয়ে, প্রকৃতির পাঠশালায় আমার প্রাথমিক পড়া সাঙ্গ করে এক শীতের বিকেলে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে রূপচাঁদ লেনের বাড়িতে উঠলাম। ওপরে নিচে মাত্র পাঁচটা কামরা, তাও ছোট ছোট, রাস্তার ঠিক ওপরই বাড়ি।

এ বাড়িতে ওঠার কয়েক মাস পরই আমার মা মারা যান। পাঁচজন মানুষের ছোট্ট সাজানো সংসার চোখের নিমেষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আমি প্রচন্ড রকম একা হয়ে গেলাম।

সাধু গ্রেগরির দিনের শুরু

রূপচাঁদ লেনের বাড়িতে কাজের লোক একজনই ছিলো। মা মারা যাওয়ার সময় ছোট ভাই বাবলুর বয়স বছর দেড়েক হবে, আমার সাড়ে চারের ওপরে। রূপচাঁদ লেনের বাড়ি থেকে ভাইয়ার স্কুল মিনিট দশেকের পথ, স্কুলে যেতে আসতে তার কোনো অসুবিধে হয় না। আমি তখনও স্কুলে যাই না, বাড়িতে একা থাকতে পারি। সমস্যা হলো দেড় বছরের বাবলুকে নিয়ে। বাবা ওকে অফিসে যাওয়ার সময় রোজ সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। অফিসে ওঁর ঘরে বাবলুর জন্য বিছানা, দুধের টিন, ফ্লাস্ক, ফিডিং বটল এ সবই আলাদা এক সেট কেনা হয়েছিলো। বাবা চাকরি করতেন সেন্ট্রাল ইন্টালিজেন্স ব্যুরোতে। খুবই কড়াকড়ি আর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিলো সে অফিসে। তবু এত বড় একটা অনিয়ম নিয়ে বাবার সহকর্মী বা তাঁর ওপরওয়ালাও কখনও কিছু বলেননি। বরং তাঁরা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন বাবার প্রতি।

বাবলুকে নিয়ে বাবা অফিসে আর ভাইয়া স্কুলে চলে যাবার পর রূপচাঁদ লেনের বাড়িতে মানুষ বলতে আমি আর কাজের লোক, লোকটার নাম বোধহয় রশিদ ছিলো। রান্নাবাড়া থেকে শুরু করে বাড়ির সব কাজই ও করতো। সারাদিন ওকে থাকতে হতো নিচের তলায়। আর আমি থাকতাম ওপরে, একা নিচে নামা বারণ ছিলো। রূপচাঁদ লেনের বাড়ির সিড়ি ছিলো খুব উঁচু উঁচু, আমাকে কেউ না ধরলে এক পা এক পা করে খুব সাবধানে নামতে হতো। একবার একা উঠতে গিয়ে সিড়ির ধারে লেগে আমার থুতনি কেটে গিয়েছিলো। তার ওপর দিনের বেলায়ও সিড়ির ঘরটা অন্ধকার থাকতো। তাই বাধ্য হয়ে সারাদিন আমাকে একা ওপরে কাটাতে হতো।

ভাইয়া স্কুল থেকে ফিরেই, কোনো রকমে নাকে মুখে চারটা গুঁজে বেরিয়ে পড়তো খেলতে, আর বাবার ফিরতে ফিরতে সাতটা আটটা বাজতো। এ সময়টা খুবই কষ্টের ছিলো, তবু আমি একা থাকার এই কষ্টের কথা কাউকে বলতাম না। বাবা যে

টের পেতেন না তা নয়। অফিস থেকে ফেরার সময় কোনো দিন খেলনা গাড়ি, কোনো দিন রঙ পেন্সিলের বাক্স আর ছবি আঁকার খাতা আনতেন। মাঝে মাঝে লাল নীল রাঙতায় মোড়ানো চকলেটও আনতেন। এত সব মজার জিনিস পেয়েও কখনও আমাকে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখেননি তিনি। এ কথা বাবা পরে আমাকে বলেছেন।

আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বাবা ঠিক করলেন আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। আমিও তখন চাইছিলাম স্কুলে ভর্তি হতে। বাড়ির কাছে স্কুল তখন বেশ কয়েকটা ছিলো। ভাইয়া সেন্ট গ্রেগরির ছাত্র বলে বাবা ঠিক করলেন আমাকেও সেখানে দেবেন। সমস্যা দেখা দিলো সময় নিয়ে। যদ্দুর মনে পড়ে নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন পর আমাকে ভর্তি করানোর জন্য বাবা স্কুলে এসেছিলেন।

ভাইয়া বোধহয় আগেই হেডমাস্টারকে বলে রেখেছিলো। তখন সেন্ট গ্রেগরির হেডমাস্টার ছিলেন ব্রাদার জেমস। খুবই অমায়িক হাসিখুশি চেহারা। আমাকে আগে থেকেই তৈরি করে আনা হয়েছিলো। কোন প্রশ্নের জবাবে কী বলতে হবে আমার জানা ছিলো। বাবা নিজেই কয়েক দফা পরীক্ষা নিয়েছেন—'তোমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট ইয ইয়োর নেম। এর অর্থ হচ্ছে— তোমার নাম কী? তুমি বলবে---।'

এভাবে তৈরি হয়ে আসার ফলে ব্রাদার জেমস আমাকে আটকাতে পারলেন না। সেন্ট গ্রেগরি তখন ঢাকা শহরের সেরা স্কুল, অনেক দূর থেকে বড়লোকের ছেলেরা গাড়ি হাঁকিয়ে আসতো পুরোনো ঢাকার লক্ষীবাজারের এই স্কুলে পড়ার জন্য, সবাই জাঁক করে বলতো 'আমরা গ্রেগরিয়ান'! সেই স্কুলে ভর্তি হতে কোনো বেগ পেতে হয়নি আমাকে। অবশ্য স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে অলিখিত নিয়ম ছিলো, বড় ভাই যদি একই স্কুলে পড়ে তাহলে ছোট ভাই আগে সুযোগ পাবে।

ভর্তির জন্য আমাকে কোনো লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়নি। মৌখিক পরীক্ষা হয়েছিলো হেডমাস্টারের রুমে। বাবা চেয়ারে বসেছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রাদার জেমসের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম। আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাদার রহস্য করে বললেন, 'তুমি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছ। তবে ভর্তির জন্য অনেক দেরিতে আসিয়াছ। ক্লাসে কোনো সিট খালি নাই। তুমি কোথায় বসিয়া লেখাপড়া করিবে?'

গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিলাম, 'আমি জানালার ওপর বসে পড়বো।'

বাবা আর ব্রাদার জেমস আমার কথা শুনে খুব হেসেছিলেন। তবে আমাকে জানালায় নয়, বেঞ্চেই বসতে দেয়া হয়েছিলো। আমাকে নেয়া হলো ইনফ্যান্ট ক্লাসে। সেদিন থেকে শুরু হলো আমার সেন্ট গ্রেগরির দিনগুলি। সেটা ছিলো '৫৫ সালের ফেব্রুয়ারির কোনো এক দিন।

তখন স্কুলে ঢোকার প্রধান ফটক ছিলো গির্জার ঠিক সামনে। মিউনিসিপালিটির সামনের রাস্তাও এত চওড়া ছিলো না। স্কুলের পাচিলও ছিলো অনেক নিচু। স্কুলে ঢুকে সোজা গেলে পড়তো গির্জা, বাঁ হাতে লাল সুরকি বিছানো রাস্তা দিয়ে খানিকটা গেলে স্কুলের মেইন বিল্ডিং। হেডমাস্টারের অফিস, টিচারদের কমন রুম, লাইব্রেরি আর

ছোট খাট একটা সায়েন্স মিউজিয়াম ছিলো এই বিল্ডিং-এ। এ ছাড়া ক্লাসরুমও ছিলো বেশ কয়েকটা।

সুরকি বিছানো রাস্তার দু' পাশে ছিলো চমৎকার ফুলের বাগান। পাচিল ঘেঁষে অনেকগুলো হলুদ করবি ফুলের গাছ ছিলো, সারা বছরই ফুল ফুটতো। এরিকো পামের ঝোপ ছিলো কয়েকটা, ফাঁকে ফাঁকে গোলাপ ও মৌসুমি ফুলের গাছ। রোজ বিকেলে মালি নয়তো ফ্র্যাঙ্কি নামের ফর্শা, শুকনো ভদ্রলোক পাইপের পানি ছিটিয়ে গাছের পাতা ধুয়ে দিতেন। ফ্র্যাঙ্কির স্ট্যাম্প জমানোর সখ ছিলো। বড়রা ফ্র্যাঙ্কির রোগা, লম্বা লিকলিকে শরীর নিয়ে অনেক জ্বালাতন করতো, ছোটরা ফ্র্যাঙ্কিকে ভালোবাসতো। ও খুশি হলে কাউকে বাগান থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে দিতো, ডুপ্লিকেট হলে স্ট্যাম্পও দিতো। আমার সঙ্গে ওর ভারি ভাব ছিলো। পরে কলেজে উঠে ওকে নিয়ে 'এ্যান্টনি বুড়ো' নামে একটা গল্প লিখেছিলাম।

মেইন বিল্ডিং-এর পাশে বাবুর্চিখানা, তার পাশে দার্জিলিং বিল্ডিং। ব্রাদারদের খাবার ঘর আর ল্যাবরেটরি ছিলো দার্জিলিং বিল্ডিং-এর নিচের তলায়। ওপরের তলায় ক্লাসরুম। ব্রাদাররা থাকতেন মেইন বিল্ডিং-এর দোতালায়। দার্জিলিং বিল্ডিং-এর সামনে পাকা টেনিস কোর্ট। ছুটির দিনে ব্রাদাররা ওখানে টেনিস খেলতেন আর স্কুলের দিনে ওখানে স্কাউট আর কাবদের পিটি প্যারেড এসব হতো।

টেনিস কোর্টের আরেক মাথায় ছিলো হোস্টেল বিল্ডিং। আগে ওখানে খৃষ্টান ছাত্ররা থাকতো, পরে হোস্টেল উঠিয়ে দিয়ে পুরোটাই ক্লাসরুম করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্লাসরুম ছিলো এই বিল্ডিং-এ। টেনিস কোর্টের বাঁ দিকে টয়লেট আর পানি খাওয়ার কলের সারি। টয়লেটের সামনে বড় একটা দেবদারু গাছ। দেবদারু গাছের বাঁ দিকে বাস্কেটবল কোর্ট আর সামনে খেলার মাঠ। মাঠের শেষ মাথায় ডানদিকে হ্যান্ডবল খেলার কোর্ট আর বাঁ দিকে টিনের ছাদ, সামনে বারান্দাওয়ালা দুটো কামরা। এরই ডান পাশের কামরায় বসতো ইনফ্যান্ট ক্লাস আর বাঁ পাশে ক্লাস ওয়ান। ঘর দুটোর সামনে কয়েকটা কাঁঠাল গাছ ছিলো, গাছের তলায় টেবিল টেনিস খেলার পাকা কংক্রিটের টেবিল।

মেইন বিল্ডিং-এর পেছনে আর হোস্টেল বিল্ডিং-এর সামনে খেলার বড় মাঠ, সেই মাঠের শেষ মাথায় ইনফ্যান্ট, ওয়ানের মতো দুটো ঘর। একটা ক্লাসরুম আরেকটা স্কাউটদের তাঁবু, বাঁশ, দড়ি, বালতি এসব রাখার ডেন। ওটার পাশে হ্যান্ডবল খেলার শান বাঁধানো খোলা জায়গা ছিলো।

মস্ত বড় স্কুল। বিল্ডিংগুলো প্রত্যেক বছর চুনকাম করা হতো, বিকেল বেলা স্কাউটরা তাদের ট্রেনিং-এর অংশ হিসেবে মাঠ থেকে শুকনো পাতা, কাগজের টুকরো কিংবা ফলের খোসা কুড়িয়ে সব পরিস্কার করে রাখতো। রূপচাঁদ লেনের ঘিঞ্জি গলির খুপরির মতো ছোট্ট বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকালে খোলামেলা ঝকঝকে বাগান ঘেরা স্কুলে এসে মনটা ভরে যেতো।

স্কুলের পেছন দিকে অগ্নিকোণে ছোট্ট একটা দরজা ছিলো। যারা গেন্ডারিয়া,

সূত্রাপুর, কাগজিটোলা, ফরাশগঞ্জ, ডালপট্টি আর পাতলা খান লেন থেকে আসতো তারা পেছনের ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতো। ওটা ছিলো হ্যান্ডবল কোর্টের পাশে। কখনও দরজা ওটা বন্ধ থাকলে ঘুরে সামনের গেট দিয়ে আসতে হতো। তাতে পাঁচ ছ মিনিট সময় বেশি লাগতো। সেন্ট গ্রেগরির স্কুল কম্পাউন্ড কম বড় ছিলো না।

লক্ষ্মী বাজারে মিশনারিদের স্কুল আরও ছিলো। সেন্ট গ্রেগরির পশ্চিম দিকের পাচিল ঘেঁষে মেয়েদের সেন্ট ফ্রান্সিস আর দার্জিলিং বিল্ডিং বরাবর উল্টো দিকে ছেলেদের সেন্ট জোসেফ। সেন্ট ফ্রান্সিস–এ অবশ্য ক্লাস থ্রি পর্যন্ত ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে পড়তো, ক্লাস ফোরে উঠে ওরা আমাদের স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে ক্লাস ফোরে ভর্তি হতো। বাংলা মিডিয়াম ইনফ্যান্ট থেকে শুরু হলেও ইংলিশ মিডিয়ামের ক্লাস শুরু হতো ক্লাস ফোর থেকে।

মিডিয়াম বাংলা হলেও ক্লাস ফোর থেকে আমাদেরও রেডিয়েন্ট ওয়েয আর ক্লাস সিক্স–এ রেন এ্যাণ্ড মার্টিন–এর গ্রামার পড়তে হতো। ক্লাস এইট থেকে বাংলা মিডিয়ামেও ইংরেজির ক্লাস ব্রাদাররা নিতেন।

সেন্ট ফ্রান্সিস আর সেন্ট জোসেফ–এর ছেলে মেয়েরা সব নীল সাদা ইউনিফর্ম পরে স্কুলে আসতো। আমাদের স্কুলের ছেলেরা কেন ইউনিফর্ম পরে না, কেন যে যার খুশি মতো পোষাক পরে স্কুলে আসে ওপরের ক্লাসে উঠে কারণ জেনেছি। সেন্ট গ্রেগরিতে ছাত্রদের অভিভাবকদের আপত্তির কারণে নাকি ইউনিফর্ম প্রথা চালু করা যায়নি। ধনীদের ছেলেরা আর গরিব ঘরের ছেলেরা স্কুলে একই রকম পোষাক পরলে বড়লোকী দেখানোর সুযোগ কম থাকে। বড়লোকদের অখুশি করতে চাননি বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই অমানবিক নিয়ম মেনে নিয়েছিলেন।

এমনিতে লক্ষ্মীবাজারের ওই রাস্তাটা ছিলো নিরিবিলি। আমাদের স্কুল ছুটির সময় গাড়ির বিরাট জটলা হতো, রাস্তা জাম হয়ে যেতো। কোনো কোনো ছেলের গাড়ি স্কুলের পুরো সময়ই বাইরে দাঁড়ানো থাকতো, যদি কখনও ওদের সোনার ছেলেটির মন খারাপ করে, ক্লাস করতে না চায়— বাড়ি ফিরবে কিভাবে? তারপরও এরা ছিলো সংখ্যায় খুবই কম। বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। কিছু গরিব খৃষ্টান ছাত্র বিনা বেতনে পড়তো, শুরুতে তো স্কুলটা ওদেরই জন্য বানানো হয়েছিলো।

ইনফ্যান্টে যতদূর মনে পড়ে আমাদের ক্লাস নিতেন এ্যান্টনি গোমেয স্যার। সকাল আটটায় ক্লাস শুরু হতো। শেষ হতো দশটায়। দু ঘন্টায় চারটা পিরিয়ড তিনি একাই ক্লাস নিতেন। এ্যান্টনি স্যার ক্লাসে ট্রান্সস্লেশনও শেখাতেন। হাতের লেখার ক্লাসে লিখতে দিতেন The name of our school is St. Gregory's High English School. আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ লেখাতেন– 'আমাদের স্কুলের নাম হয় সাধু গ্রেগরির উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়।'

সাধু গ্রেগরি কোথাকার সাধু, কবেকার সাধু এ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না। হয়তো খৃষ্টান ছেলেদের ধর্মের ক্লাসে এসব সাধুসন্তদের কথা পড়ানো হতো। বাইরে কারও কারও তখন ধারণা ছিলো মিশনারি স্কুলগুলো বুঝি খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য

বানানো হয়েছে। স্কুলে এগারো বছর পড়ার সময় তেমন কিছু কখনও টের পাইনি। গরিব খৃষ্টান ছেলেদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ ছিলো, খৃষ্টানদের পরব 'ইস্টার' বা 'গুড ফ্রাইডে'তে স্কুল বন্ধ থাকতো— এ ছাড়া আর কোনো খৃষ্টানী কারবার আমাদের স্কুলে ছিলো না। নবীর জন্মদিনে প্রতি বছর ক্লাস নাইনের মুসলমান ছেলেরা মিলাদ পড়াতো, এর জন্য আলাদা চাঁদাও দিতে হতো, তবে মিলাদ হতো স্কুলের বাইরে। কখনও বার লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে, কখনও জগন্নাথ কলেজের বড় কোনো কামরায়— সব ব্যবস্থা ক্লাস নাইনের ছেলেরাই করতো। স্কুলে পাঁচ ছয়শ' ছেলের মিলাদ পড়ার মতো বড় কোনো কামরা ছিলো না। হিন্দু ছেলেরা মাঠের এক কোণে শামিয়ানা খাটিয়ে সরস্বতী পূজোর আয়োজন করতো। অন্যরা দেখতে গেলে পূজোর প্রসাদ পেতো।

স্কুলের গির্জায় ঘন্টা বাজাতো অন্ধ পিটার। হাত দুটো সামনে মেলে ধরে সারা স্কুল হাঁটতো পিটার। মুখে বসন্তের দাগ, কালো নিরীহ মানুষটা। অনেক উঁচুতে গির্জায় চূড়ায় বাঁধা ছিলো মস্ত বড় ঘন্টা। নিচে ঘন্টার সঙ্গে বাঁধা মোটা দড়ি দেয়ালের এক পাশে আটকানো থাকতো। অসম্ভব ভারি সেই ঘন্টা টানতে খুব পরিশ্রম হতো পিটারের। ঘন্টা বাজানো শেষ করে গির্জায় ছায়াঢাকা ঠাণ্ডা কালো পাথরের সিড়িতে বসতো। ছেলেদের কখনও ঘন্টার দড়ি ধরতে দিতো না। বলতো ওটা ধরলে নাকি টেনে ঘন্টাঘরে নিয়ে যাবে। কষ্ট হলেও পিটার ঘন্টা টেনে আনন্দ পেতো। বলতো, 'ঈশ্বরের অপরিসীম দয়া, ওকে এমন পবিত্র কাজের ভার দিয়েছেন।'

ইনফ্যান্টে আমাদের ক্লাসে কী পড়ানো হতো আমার স্পষ্ট মনে নেই। তবে আমার জন্য বাবা একজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন। তাঁর নাম ছিলো নজিবর রহমান, পাবনা বাড়ি, কথাও বলতেন পাবনার আঞ্চলিক উচ্চারণে। প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন তাঁকে যেন 'মাস্টার সাহেব' ডাকি।

সন্ধ্যার পর মাস্টার সাহেব শুধু আমাকেই পড়াতেন। সেই সময়টা ভাইয়া দুষ্টমি করে কাটাতো। মাঝে মাঝে দুষ্টুমির মাত্রা বেশি হয়ে গেলে মাস্টার সাহেব নিচু গলায় বলতেন, 'ও কী হচ্ছে! তোমার বাবাকে আমি সব বলে দেবো।'

ভাইয়াকে মা কড়া শাসনের ভেতর বড় করেছিলেন। যে কারণে ক্লাস থ্রি থেকে ভাইয়াকে ডবল প্রমোশন দিয়ে ক্লাস ফাইভে তুলে দেয়া হয়েছিলো। মা মারা যাবার পর হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে ভাইয়া খুবই বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলো। সব সময় আমাকে পেটানোর একটা ছুতো খুঁজে বেড়াতো। মাস্টার সাহেব আসার আগে নিজেই পড়াতো। কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো। না পারলে মারতো। একবার মারের মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়ায় রাতে বাবাকে বলেছিলাম। বাবা ভাইয়াকে খুব বকেছিলেন। পরদিন বাবাকে বলার জন্য দ্বিগুণ মার খেতে হয়েছিলো। বেশি মারের ভয়ে আর কখনও বাবাকে বলিনি। ভাইয়া তখন আমার কাছে সবচেয়ে ভয়ের মানুষ ছিলো।

মাস্টার সাহেব পড়ানো শুরু করার পর থেকে পড়া না পারার ছুতোয় আমাকে মারার সুযোগ ভাইয়ার কমে গিয়েছিলো। তবে নতুন ফন্দি বের করতে তার জুড়ি ছিলো

না। একবার ঈদের ছুটির পর মাস্টার সাহেব যখন পড়াতে এলেন, ভাইয়া গিয়ে টুপ করে তাঁর পা ধরে সালাম করলো। আমাকেও বললো মাস্টার সাহেবেকে সালাম করতে।

ছোটবেলায় আমার এক অদ্ভুত স্বভাব ছিলো— কাউকে পা ধরে সালাম করতাম না। এমনকি বাবা মাকেও না। রূপচাঁদ লেনের বাড়িতে মা যখন বেঁচেছিলেন আমাকে সালাম শেখানোর জন্য তিনি এক বুদ্ধি বের করেছিলেন। আগের দিন বাবা এক ঝুড়ি কমলা এনেছিলেন। কমলা আমি খুব পছন্দ করতাম। মা আমাদের দুই ভাইকে ডেকে বললেন, 'আমাকে একবার সালাম করলে একটা করে কমলা পাবে।' বলা মাত্র ভাইয়া মাকে সালাম করে কমলা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। মনে মনে ভাবছিলাম আমার বেলায় মা বুঝি নিয়ম পাল্টাবেন। মার জেদও কম ছিলো না। সাড়ে চার বছরের এইটুকুন একটা ছেলের অবাধ্যতা তিনি মেনে নিতে পারেননি। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নির্বিকার গলায় বললেন, 'সালাম না করলে কমলা পবে না।' আমার চোখের সামনে ভাইয়া একটা কমলা সাবাড় করে এসে টুপ করে মা'র পা ছুঁয়ে আরেকটা কমলা নিয়ে চলে যাচ্ছিলো। আমি শুধু তাকিয়ে দেখলাম কমলার ঝুড়িটা কিভাবে খালি হয়ে গেলো।

আমার এই স্বভাবের কথা জানা ছিলো বলে ভাইয়া সেদিন মারার অজুহাত খুঁজতে গিয়ে মাস্টার সাহেবকে সালাম করতে বলেছিলো। আমি যথারীতি এই নির্দেশ উপেক্ষা করলাম। মাস্টার সাহেবের সামনেই ভাইয়া আমাকে মারলো। দুঃখের বিষয় মাস্টার সাহেবও ভাইয়াকে বারণ করলেন না। আমার চোখের পানিতে সামনে মেলে ধরা বই ভিজে গেলো। পড়াশোনা সেদিন শিকেয় উঠেছিলো।

রাতে বাবার কাছে নালিশ করে ভাইয়া আমাকে বকুনি খাওয়ালো। ঘুমোতে গিয়ে কেঁদে বালিশ ভেজালাম। তখন শুধু মা'র কথা মনে পড়তো। মা থাকলে ভাইয়া এভাবে আমাকে মারতে পারতো না।

মা বেঁচে থাকতে অনেক সময় লক্ষ্য করেছি ভাইয়ার চেয়ে মা আমাকে বেশি আদর করতেন। যদিও ভাইয়া দেখতে অনেক সুন্দর ছিলো, আমি ছিলাম কালো গোবেচারা ধরনের, জানি না কেন, আমার ওপর মা'র পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিলো। রূপচাঁদ লেনের বাড়িতে বাবা অফিসে আর ভাইয়া স্কুলে চলে যাবার পর আমি ছিলাম মার একমাত্র সঙ্গী। ছোট ভাইটা খুব রোগা ছিলো, বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটাতো, বাড়িতে ওর অস্তিত্ব টের পাওয়া যেতো না। দুপুরে মার পাশে শুয়ে তাঁর পিঠের ঘামাচি মেরে দিতাম। মা'র পেটে যোগ চিহ্নের মতো কাটা দাগ ছিলো। ওটা কিভাবে হলো জিজ্ঞেস করলে মা বলতেন, 'তোর জন্মাবার সময় আমার পেট কাটতে হয়েছিলো এটা সেই কাটা দাগ।'

'৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় মা খুব খেটেছিলেন। বেগম শামসুননাহার মাহমুদ ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে। মার সঙ্গে কলকাতা থাকতেই ওঁর পরিচয় ছিলো। থাকতেন পুরানা পল্টনে। মনে আছে মস্ত বড় একটা পুকুরের ধারে এখন যেখানে হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের বিশাল ভবন, তার

উত্তর পূর্ব কোণে ছিলো পুকুরটা। মা'র সঙ্গে রিকশায় করে তাঁর বাড়িতে যেতাম। মাকে নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা দিতেও দেখেছি। কী বলতেন সেসব মনে নেই, তবে জুবিলী স্কুলের মাঠে এক জনসভায় দুপুর বেলা বক্তৃতা দেয়ার পর অফিসে এসে বসেছেন— মনে আছে আয়োজকরা খেতে দিয়েছিলো সন্দেশ আর সিঙাড়া। মা দেখে বললেন, 'এরকম কাঠফাটা দুপুরে এসব শুকনো খাবার কেন, ডাব রাখলে পারতেন।'

মা সারাদিন মুসলিম লীগের হয়ে বক্তৃতা করে হয়রান হয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি আসতেন। বাবা অফিস থেকে ফিরে এ নিয়ে ঠাট্টা করতেন। বাবা ছিলেন যুক্তফ্রন্টের সমর্থক, বলতেন, 'তোমাদের হারিকেনে তেল ফুরিয়ে গেছে। ওটা আর জ্বলবে না।' শুনে মা খুব রেগে যেতেন। হারিকেন ছিলো মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রতীক।

সেবার নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়েছিলো। মা চলে গেলেন ইন্ডিয়া বেড়াতে। ফেরার পথে আজমীরে খাজাবাবার দরগা জেয়ারত করবেন। আমাকে বললেন, 'তোমার জন্য কী আনবো?' আমি বলেছিলাম বড় দেখে একটা মোটর গাড়ি আনতে, যেটা চালাবে একটা বাঁদর, আর চারটা বাঁদর বসা থাকবে। এমন অদ্ভুত খেলনা কোথাও দেখিনি বলেই আমার ইচ্ছা হয়েছিলো তেমন একটা আমার কাছে থাকুক।

রূপচাঁদ লেনে তখন বাঁদরের ভীষণ উৎপাত ছিলো। একবার পেছনের উঠোনে আমরা একটা বাঁদরছানা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। গলায় বকলস লাগিয়ে তার সঙ্গে শেকল বেঁধে ওটাকে পুষতাম। মা ওটাকে ছোট ছোট জামা শেলাই করে দিয়েছিলেন। মা মারা যাবার পর বাঁদরটা সব সময় মন মরা হয়ে থাকতো। ঠিক মতো খেতো না। দু তিন মাস পর গলার চেন–এ নিজে নিজেকে ফাঁসি দিয়ে মরে গিয়েছিলো বাঁদরটা। এরপর বহু বছর আমরা কোনো প্রাণী পুষিনি।

দিল্লী থেকে মা আমার জন্য চাবি দেয়া একটা মোটর গাড়ি এনেছিলেন তবে বাঁদরের বদলে ওটাতে মানুষ বসা ছিলো। বললেন, বহু খুঁজেও নাকি বাঁদর চালানো গাড়ি কোথাও পাননি।

মা মারা যাওয়ার পর ভাইয়া যে আমাকে কারণে অকারণে পেটাতো তার একটা কারণ পরে মনে হয়েছে আমার জন্য মা'র বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। যে আমি জন্মবার পর মা নানীকে চিঠি লিখেছিলেন— 'আপনার একটা নাতি হয়েছে। পাতিলের তলার মতো কুচকুচে কালো। ধরলে মনে হয় হাত কালো হয়ে যাবে। কে জানে হাসপাতাল থেকে বদল করে দিয়েছে কিনা।' সেই আমার প্রতি মা'র পক্ষপাতিত্বের কারণ পরে মনে হয়েছে আমি ওঁরই স্বভাব পেয়েছিলাম। স্বভাবটা ভালো এ কথা বলছি না, ওই যে একগুয়েমি আর জেদ, যেটা ছোটবেলায় বেশি রকম ছিলো আমার ভেতর, সেটা পেয়েছিলাম মার কাছ থেকে। মা'র ছিলো প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ, আর এক ধরনের অহংকার সেটাও পেয়েছিলাম বেশ খানিকটা। এর ফলে প্রথম দিকে স্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে আমি খুব একটা মেলামেশা করতাম না।

একা থেকে অনেকের ভিড়ে

ভাবতে এটা খুব আশ্চর্য ঘটনা মনে হয় ক্লাস ইনফ্যান্ট ওয়ানে আমার কোনো বন্ধু ছিলো না। বাড়ির কাজের লোক রশিদ সকালে আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে রায় সাহেবের বাজারে যেতো বাজার করতে। বাজার থেকে ফেরার পথে স্কুল থেকে আমাকে নিয়ে যেতো। ক্লাস ওয়ানে ওঠার পর একাই স্কুলে যাওয়া আসা করতাম।

তখন আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে দাদী এসে বছর খানেক ছিলেন আমাদের সঙ্গে। দাদী বাবার আপন মা নন, সৎমা। গ্রামে তিনি তাঁর ছেলের কাছে থাকতেন। তাঁকে আমরা ডাকতাম 'দেশের চাচা' বলে। গ্রামের বাড়ি মানে দেশের বাড়ি। ক্লাসে টিচারও ছেলেদের জিজ্ঞেস করতেন 'দেশ কোথায়।'

আজকাল ছেলেমেয়েরা খুব স্মার্ট হয়েছে। কেউ 'দেশ কোথায়' জিজ্ঞেস করলে ওরা জবাব দেয় 'বাংলাদেশ।' আমাদের সময় এটাই জানা ছিলো— 'দেশ' মানে গ্রামের বাড়ি। তখন নোয়াখালি ভাগ হয়নি। আমাদের বাড়ি ছিলো সোনাগাজী থানার মজুপুর গ্রামে। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বারবরই কম ছিলো। ক্লাস সিক্স-এ উঠে একবার, আরেকবার এস এস সি পরীক্ষা পর বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম। এ পর্যন্ত আর গ্রামের বাড়িতে যাইনি। কদিন আগেও ছোড়দা, আমার জেঠুতুতো ভাইদের ভেতর যিনি এখন সবচেয়ে বড়, দুঃখ করে বলছিলেন, তোরা যে দেশের বাড়ির বিষয়সম্পত্তি বুঝে নিচ্ছিস না, আমার কিছু হলে বলারও কেউ থাকবে না কোনটা তোদের।

বাবা, জেঠু সবাই পড়াশোনা করেছেন কলকাতায়। খিদিরপুরে দাদার ব্যবসা ছিলো ক্লিয়ারিং এজেন্ট-এর। দেশ ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত বাবা আর জেঠু চাকরিও করেছেন কলকাতায়। '৪৭-এ ইংরেজরা যখন ভারতকে দু' টুকরো করে দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে গেলো, বাবারা চলে এলেন পাকিস্তানে। গ্রামের বাড়ির সঙ্গে বাবার যোগাযোগ ছিলো খুব ক্ষীণ।

মা মারা যাওয়ার বেশ কয়েক মাস পর দেশ থেকে দাদী এসে যখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখন তাঁর কাছে দেশের কথা প্রথম শুনেছি। রাতে দাদী রূপকথার গল্প শোনাতেন। সে সব গল্পের মাঝে মাঝে গান থাকতো। গানের অংশটুকু দাদী সুর করে বলতেন। গল্পের ভাণ্ডার তাঁর খুব বেশি সমৃদ্ধ ছিলো না। কদিন পর একই গল্প আবার বলতেন।

ছোট ভাই বাবলুকে নিয়ে বাবার অফিস করার বিড়ম্বনা দাদী আসার আগেই কিছুটা মিটেছিলো। আমার এক খালা ওকে নিয়ে গেলেন গ্রামের বাড়িতে। বছর দুয়েক ও খালার কাছে ছিলো। পরে জেঠিমা খালার বাড়ি গিয়ে দেখেন চার বছরের ছেলেকে দিয়ে খালা বাড়ির কাজ করাচ্ছেন। খালার সঙ্গে ঝগড়া করে জেঠিমা ওকে নিয়ে এলেন। আমরা তখন পটুয়াটুলিতে বাবার ইন্সটিটিউটের এক কামরায় থাকি। রূপচাঁদ লেনের বাড়ি নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধাতে জেঠু ওটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

ইন্সটিটিউটে যখন প্রথম এলাম বাবলু তখন ছিলো না। বাবা, আমরা দু ভাই আর আমার প্রায়-সমবয়সী একটা কাজের ছেলে। ওর নাম ছিলো কাশেম। ওর সঙ্গে ভারি ভাব ছিলো আমার। ভাইয়া যেদিন আমাকে বেশি মারতো ও একা পেলে আমাকে সান্ত্বনা দিতো। নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতো ও— 'চলো আমার দূরে কোথাও চলে যাই।'

আমি বলতাম, 'কোথায় যাবো?'

'আমাদের দেশের বাড়িতে।'

'তোদের বাড়ি গেলে ঠিক ধরে নিয়ে আসবে।'

'তাহলে চলো চাঁটগাঁ চলে যাই।'

'যাবো কিভাবে, ওখানে গিয়ে থাকবো কোথায়, খাবো কী?'

'ট্রেনে উঠে ভিক্ষা করতে করতে যাবো। চাটগাঁ গিয়ে ভিক্ষা করে খাবো। রাতে কারও বাড়ির বারান্দায় শুয়ে থাকবো।'

ট্রেনে ভিক্ষা করতে করতে চাটগাঁ যাওয়ার পরিকল্পনা তখন যথেষ্ট রোমাঞ্চকর মনে হলেও সেখানে গিয়ে বাকি জীবন ভিক্ষা করে কাটাবো এটা আমার পছন্দ হতো না। কাশেম তারও সমাধান করে দিতো—'সারা জীবন ভিক্ষা করে খাবো কেন? জাহাজ খালাসির চাকরি নেবো। জাহাজে করে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো।'

একদিন স্কুলে যাওয়ার আগে ভাইয়ার মার খেয়ে ঠিক করলাম সেদিনই বাড়ি ছাড়বো। স্কুল ছুটির পর ঘরে ফিরে কাশেমকে বললাম, 'চল আজই বেরিয়ে পড়ি।'

বলা মাত্র কাশেম রাজী হয়ে গেলো। আমরা দু'জন ঘরে তালা দিয়ে নিচে নেমে রাস্তায় পা দিয়েছি তখন দেখি ছোট মামা হন হন করে আসছেন আমাদের বাসার দিকে। কাছে এসে বললেন, 'কি রে কোথায় যাচ্ছিস?'

কোথায় যাচ্ছি এ কথা মামাকে বলি কিভাবে। কাশেম বললো, 'মেজো ভাইকে বড় ভাই খুব মেরেছে।'

'তাই বুঝি?' ছোট মামা রেগে বললেন, 'ওর তো খুব সাহস বেড়েছে! দাঁড়া,

দুলাভাই আসুক, মেরে ওর পিঠের চামড়া তুলে নেবো।'

ছোট মামাকে নিয়ে ঘরে ফিরলাম। ছোট মামা দুপুরে আমাদের সঙ্গে খেলেন। পটুয়াটুলির বাড়িতে রান্নার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। সকালে খেতাম পাউরুটি, মাখন আর জেলি। দুপুরে আর রাতের খাবার আসতো হোটেল থেকে। মাস কাবারি ব্যবস্থা ছিলো। কাশেম গিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারে করে ভাত, ডাল, একটা তরকারি আর মাছ নয়তো মাংস আনতো। রোজ এক রকম খাবার। কিছুই করার ছিলো না। বাবা তখন একটা বড় বাড়ি খুঁজছিলেন, যাতে জেঠুদের সঙ্গে একত্রে থাকা যায়।

বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পরই ছোট মামা, আমরা যাকে 'বাচ্চা মামা' বলে ডাকতাম, বাবাকে নিয়ে পড়লেন। ভাইয়ার নাম ধরে বললেন, 'ওকে আপনি শাসন না করে করে মাথায় তুলেছেন। এই ছেলেটাকে মেরে কী করেছে দেখেছেন?'

আমার পিঠে তখনও মারের দাগ ছিলো। দেখে বাবা খুব রেগে গেলেন। ভাইয়া স্কুল থেকে ফেরার পর ওকে বেল্ট দিয়ে মেরেছিলেন। এর ফলে ভাইয়া ছোট মামার ওপর খুব রেগে গেলো। সেবার ছোট মামা বোধহয় কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছিলেন। আমার মা ছাড়া ছোট মামাকে 'ওর ভাইবোনরা কেউ পছন্দ করতেন না বখে গিয়েছিলেন বলে। বখে যাওয়া মানে দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে তিনি খালাদের ভাষায় 'টো টো কোম্পানির ম্যানেজার' হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। নবরায় লেনের বাড়িতে ছোট মামা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন।

পরদিন বাবা অফিসে চলে যাওয়ার পর ভাইয়া ছোট মামাকে এমন সব আজে বাজে কথা বললো যে, সেই দণ্ডেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ বাবা ভাইয়াকে চার আনা আর আমাকে দু আনা দিতেন টিফিন খাওয়ার জন্য। ক্লাস টু পর্যন্ত স্কুলে আমাদের মাত্র দু' ঘন্টা ক্লাস করতে হতো। ছুটির পর গেটের বাইরে থেকে পেয়ারা কিনে খেতাম। স্কুলের ভেতরেও মিয়া নামে একজন সাইকেল ভ্যানে নানা রকমের কাচের বয়েম-এ মজার মজার সব খাবার সাজিয়ে বসতো বিক্রি করার জন্য। মিয়া বসতো মেইন বিল্ডিং-এর সামনে বকুল তলায়। ওর দোকানে সবচেয়ে মজার টিফিন ছিলো ছোট ছোট ক্ষীরের সন্দেশ। এক আনায় দুটো পাওয়া যেতো। সন্দেশ ছাড়াও রাঙতা মোড়ানো চকলেট, নকুলদানা, মুড়কি, মুরলি এসব থাকতো। মিয়ার দোকানের সন্দেশ আমার খুব ভালো লাগতো।

বাবার মার খাওয়ার পরদিন ভাইয়া নিয়ম করে দিলো আমার টিফিনের পয়সা ওকে দিয়ে দিতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার শাস্তি। বেশ কিছুদিন এভাবেই চলেছিলো। ক্লাস থ্রিতে ওঠার পর স্কুলের সময় যখন দশটা থেকে চারটা হলো তখন ভাইয়া দয়া পরবশ হয়ে এ নিয়ম প্রত্যাহার করেছিলো।

স্কুলে থাকতে ক্লাস এইট পর্যন্ত ভাইয়ার মার খেয়েছি মুখ বুজে। নাইন-এ উঠে একদিন বিদ্রোহ করেছিলাম। ভাইয়া তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, অনেকগুলো বান্ধবী ছিলো ওর। আমার কাজ ছিলো ওদের চিঠিপত্র আনা নেয়া করা। ভাইয়া পই পই করে বলে দিয়েছিলো বান্ধবীদের একজনের কথা যেন আরেকজনকে না বলি। সুযোগ বুঝে

আমিও একদিন বলে ফেললাম, 'আমার গায়ে যদি আর কখনও হাত তোলেন সবাইকে সবার কথা বলে দেবো, একজনের চিঠি আরেকজনকে দেবো। বাবাকেও সব বলে দেবো।'

শুনে ভাইয়া বেচারার মুখ শুকিয়ে চুন হয়ে গেলো। আমাকে সিনেমা দেখিয়ে, নবাবপুরের খোশমহল রেস্টুরেন্টে সামুচা খাইয়ে কথা আদায় করে নিলো তার বান্ধবীদের কথা গোপন রাখবো।

ক্লাস টুতে ওঠার ওপর ভাইয়ার শাসনে খানিকটা ভাটা পড়েছিলো, যখন আমরা ওয়াইজ ঘাটের বাড়িতে এলাম। ওয়াইজ ঘাটের সদর রাস্তা থেকে একটু ভেতরে কুমারটুলিতে, যে বাড়িটা আগে বাবার অফিস ছিলো। বাবাদের অফিস '৫৭ সালে সেগুন বাগিচায় নতুন বাড়িতে সরে গিয়েছিলো। বাবা আর তাঁর এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সহকর্মী অগলি সাহেবকে থাকার জন্য বালিয়াটির জমিদারদের এই বিশাল বাড়িটা সরকারীভাবে বরাদ্দ করা হলো। বাবাকে দেয়া হলো দোতালা, অগলী সাহেবকে একতলা। বাড়িটা আগে ছিলো জমিদারদের কাচারি আর নাচঘর। মস্ত বড় হলরুম ছিলো যেটার মেঝে চার ইঞ্চি পুরু সেগুন কাঠের। দরজা জানালাও ছিলো বিরাট বড়। বাইরে মস্ত বড় ঝুল বারান্দা, ঝুল বারান্দার এ পাশে চওড়া টানা বারান্দা। এক নাগাড়ে দশ বছর ছিলাম এ বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জেঠুরাও উঠলেন কুমারটুলির বাড়িটায়। দশ বছর আগে দেশ ভাগ হওয়ার পর কলকাতার দেবেন্দ্র ম্যানসন থেকে দু ভাই আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। এক সঙ্গে থাকার জন্য নতুন পাকিস্তানে বাড়ি পেতে ওঁদের দশ বছর লেগেছিলো। বাবা আর জেঠুর মতো ভাইঅন্ত প্রাণ আর কাউকে দেখিনি।

জেঠু তখন আলীয়া মাদ্রাসার প্রফেসর, বড়দা শহীদুল্লা কায়সার কমিউনিস্ট পার্টির বড় নেতা, দৈনিক সংবাদ–এর বার্তা সম্পাদক। মেজদা জহির রায়হান গল্প উপন্যাস লিখে তখনই দারুণ নাম করে ছবি বানাবার জন্য ঢুকেছেন এজে কারদারের ফিল্ম ইউনিটে। কারদার তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র কাহিনী নিয়ে 'জাগো হুয়া সভেরা' বানাচ্ছিলেন। বড়দির বিয়ে হয়েছিলো অনেক আগেই। দুলাভাই ডাক্তারি পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছেন। বিয়ের পর থেকে বাবা মার সঙ্গেই থাকতেন বড়দি। তারপর ছোড়দা, তখন বি কম পড়তেন। ছোড়দি মেজদি স্কুলের শেষের ক্লাসে। ছোড়দির ছোট আরও দু'ভাই মিয়া আর ছুট্টু, দুজনই বয়সে আমার চেয়ে বড়। ছুট্টু আট মাসের আর মিয়া দু বছরের বড় হলেও পড়তো একই ক্লাসে, অন্য স্কুলে।

বিরাট বাড়িতে বিরাট পরিবার। বড়দা মেজদা আর বড়দির বন্ধুরাও নিয়মিত আসতেন। সব সময় গম গম করতো বাড়িটা। বাড়ির সামনে বিরাট লন ছিলো। শীতকালে সেখানে ব্যাডমিন্টন কোর্ট কাটা হতো। বেশির ভাগ সময় বড়দি আর মেজদার বন্ধুরা সেখানে খেলতেন। ওদের ফাঁকে ফাঁকে ভাইয়া আর ছোড়দারাও খেলতো। বড়দার ঘরে মাঝে মাঝে গানের আসর বসতো। তখনও বড়দা বিয়ে করেননি। সাংবাদিকতা আর পার্টি করার সুবাদে তার বান্ধবী কম ছিলো না। বড়দার বান্ধবীদের

দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতাম আমরা। একেকজন কী অপরূপ সুন্দর দেখতে। অবশ্য বড়দাও দেখতে ছিলেন রূপকথার রাজপুত্রের মতো সুন্দর।

কুমারটুলির বাড়িতে আসার পর ভাইয়া একদিন আমাকে মেরেছিলো। কথাটা বড়দির কানে গিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে বড়দি এমন কড়া বকুনি দিলেন যে ভাইয়া সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিলো। ভাই বোন সবাই বড়দিকে অসম্ভব ভয় পেতো। ভীষণ মেজাজী ছিলেন বড়দি। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় পরীক্ষক কি কারণে তাঁকে আপত্তিকর কথা বলেছিলেন বলে পরীক্ষককে চড় মেরে বড়দি চার বছরের জন্য রাস্টিকেট হয়েছিলেন।

কুমারটুলির বাড়িতে আসার পর ছোট ভাই বাবলুকে আমাদের স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো। জেঠতুতো ভাই মিয়া, ছুট্টু আর আমার জন্য বড়দা ভালো মাস্টার ঠিক করে দিলেন। ক্লাস টু'র এ্যানুয়াল পরীক্ষায় আমি সেকেন্ড হলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে বড়দা ওঁর ঘরে ডেকে নিয়ে মিষ্টি খাওয়ালেন। ছোটরা সবাই বড়দাকে সমীহ করে চলতো। তিনি না ডাকলে তাঁর ঘরে ঢোকা বারণ ছিলো।

আরও এক অবাক করা ঘটনা ঘটালো ভাইয়া। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমাকে রূপমহল সিনেমায় বোম্বের 'বাদল' ছবিটা দেখালো। এর আগে খুব ছোট থাকতে মা'র কোলে বসে কলকাতার 'বাবলা' দেখেছিলাম। ওটার কিছুই মনে নেই। '৫৭ সালে দেখা 'বাদল' ছবিরও একটা দৃশ্যই শুধু পরে মনে ছিলো— নায়িকাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বসিয়ে নায়ক হাঁটছে আর গান গাইছে। সেটা কোনো ব্যাপার নয়, বড় কথা হচ্ছে আমার প্রতি ভাইয়ার মনোভাবের পরিবর্তন।

বাবার এক বন্ধু ছিলেন, আজাদ আঙ্কল ডাকতাম তাঁকে। তিনি এলে সঙ্গে করে খাবার আনতেন, প্যাকেটে করে কাবাব পরোটা এসব। কখনও সবাইকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতেন। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য আজাদ আঙ্কল দেখালেন রোমের গ্ল্যাডিয়েটরদের নিয়ে একটা ইংরেজি ছবি। ওটা ছিলো আমার দেখা প্রথম রঙিন ছবি। বাবার আরেকজন বন্ধু ছিলেন, আমরা ডাকতাম তনু আঙ্কল। বাবার ছোট বেলার বন্ধু। নাকি জেঠুকে লুকিয়ে ওঁরা দু'জন কলেজে পড়ার সময় কানন দেবীর ছবি দেখতেন। প্রমথেশ বড়ুয়া আর কানন দেবীর খুব ভক্ত ছিলেন বাবারা। তনু আঙ্কলও আমাদের ছবি দেখাতে নিয়ে যেতেন।

ছবি দেখতে গিয়ে সে সময় কোন ক্লাসে বসছি সেটা লক্ষ্য করা কোনো জরুরি বিষয় ছিলো না। এটুকু মনে আছে আজাদ আঙ্কল ছবি দেখাতেন দোতালায়, সিটগুলো বেশি আরামের ছিলো, ভাইয়া দেখাতো থার্ড ক্লাসে কাঠের চেয়ারে, মেজদি, ছোড়দির সঙ্গে দেখতে গেলে রিয়ার ষ্টলের পাশে মেয়েদের আলাদা জায়গায় বসতাম। ওটাকে বলা হতো লেডিস ক্লাস। তখন সিনেমা হলগুলোতে ওপরে নিচে আলাদা লেডিস ক্লাস থাকতো।

ছবি দেখার জন্য ভাইয়া কখনও আমাকে ধরতো। বলতো, 'বাবাকে গিয়ে বল, একটা টাকা দিতে।' ভাইয়া টাকা চাইলে বাবা একশটা প্রশ্ন করতেন, আমি চাইলে

আপত্তি করতেন না। এক টাকা পেলেই দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ভাইয়ার সঙ্গে ম্যাটিনি শো'তে লায়ন, রূপমহল, মুকুল, মায়া— এসব সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখতাম। তখন থার্ড ক্লাসের টিকেটের দাম আট আনা ছিলো। মনে আছে ক্লাস ফোরে পড়ার সময় ভাইয়া মৌলবি বাজারের ভেতরে তাজমহল সিনেমা হলে 'ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দ্য সি' ছবিটা দেখিয়েছিলো। ওটা যে এত নামকরা উপন্যাস তখন কিছুই জানতাম না, ভালো লেগেছিলো বুড়ো জেলেটার বিশাল মাছ ধরার দৃশ্যগুলো।

গ্রাম থেকে জেঠিমার কাকী এলেন কুমারটুলির বাড়িতে। এসেই চিন্তিত মুখে বললেন, 'এ বাড়িতে অন্য কিছু আছে। আমি পরিস্কার টের পাচ্ছি। গন্ধেই বোঝা যায়। বাড়ি বন্ধ করতে হবে।'

জেঠু শুনে মোটেই বিস্মিত হলেন না। সেকালের জমিদারদের বাড়ি, কতরকম অত্যাচার অনাচার হয়েছে। দুটো হুজুর ডেকে এনে সত্যি সত্যি বাড়ি বন্ধ করালেন। হুজুররা বাড়ির চারপাশের সীমানায় মাটির ঘটিতে দোয়াদরুদ লেখা কাগজ পুরে কিছু দূর পর পর ওগুলো পুঁতে দিলেন। জেঠিমার কাকী চমৎকার গল্প করতে পারতেন।

ক্লাস টুতে পড়ার সময় বাড়িতে আরেকটা ঘটনা ঘটেছিলো। আত্মীয় স্বজনরা সবাই মিলে বাবাকে ধরলেন বিয়ে করতে হবে। বাবার নিজের সৎমা ছিলো, ছোটবেলায় বাবা আর তাঁর বোনদের খুব জ্বালিয়েছেন। জেঠু তখন কলকাতায় থাকতেন, বাড়িতে জেঠিমা এসেছেন নতুন বউ হয়ে, মাত্র এগারো বছর বয়স তার। দাদী নাকি জেঠিমাকে মারধোর পর্যন্ত করতেন, ঠিক মতো খেতে দিতেন না। কখনও যদি বড় ফুপু আসতেন বাবারা সবাই তাঁর কাছে নালিশ করতেন। ফুপু তখন দাদীকে খুব করে বকতেন। তখন বাবার বয়স এগারো, আর সবচেয়ে ছোট ফুপুর বয়স তিন চার বছর। পরে নাকি সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় দাদীদের সঙ্গে কি সব গন্ডগোলও হয়েছিলো। এসব কারণে আবার বিয়ে করার ব্যাপারে বাবার ঘোরতর আপত্তি ছিলো।

ঘটকালি করছিলেন আমার এক খালু। তিনি বোঝালেন মা না থাকলে আমাদের কোনো যত্ন হবে না, সবাই বখে যাবো, বাবার কিছু হলে তাঁকেই বা দেখবে কে—এই সব। আর পাত্রীও তো খারাপ নয়, চীফ জাস্টিসের ভাইঝি। বড়দা কমিউনিস্ট পার্টি করতেন বলে বাবার চাকরির ক্ষেত্রে প্রমোশনের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অগলী সাহেব তাঁর জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও সুপারেন্টেন্ডেন্ট হয়ে গেছেন— এ নিয়ে অফিসের ওপর বাবার রাগ ছিলো। খালু বোঝালেন জাস্টিস, চীফ জাস্টিসরা কুটুম্ব হলে তাঁর প্রমোশন আটকে রাখা কঠিন হবে।

বাবা অবশ্য আমাদের দুই ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন নতুন মা এলে আমরা খুশি হবো কি না। শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছিলো ভাইয়ার হাত থেকে রেহাই পাবো ভেবে। ভাইয়া বাবাকে হ্যাঁ, না কিছু বলে নি। পরে আমাকে বলেছে, 'বাড়িতে সৎমা আসবে, এত লাফাচ্ছিস কেন? সৎমারা কিরকম পাজী হয় বইয়ে পড়িসনি!'

পটুয়াটুলির বাসায় থাকতে বাবা নিজেই আমাদের 'ঠাকুরমার ঝুলি,' 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'দাদামশায়ের থলে' পড়ে শুনিয়েছেন। ডিকেন্সের লেখা 'ডেভিড কপারফিল্ড'

'অলিভার টুইস্ট' 'গ্রেট এক্সপেকটেশন'-এর মতো বিখ্যাত সব ইংরেজি উপন্যাসও পড়ে বাংলায় অনুবাদ করে শোনাতেন। এসব বইয়ে সৎমাদের অত্যাচারের বহু ঘটনাই লেখা ছিলো। ভাইয়া আমাকে ভয় দেখালো সৎমারা নাকি ভয়ঙ্কর অত্যাচারী হয়, রক্ত শুষে খায়। ভাইয়ারও ভয় ছিলো—সৎমা এলে তার অখন্ড কর্তৃত্ব আর থাকবে না।

যে খালু বিয়ের ঘটকালি করছিলেন, জেঠিমার ওপর তাঁর রাগ ছিলো, ছোট ভাই বাবলুকে সেই খালাই বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঘরের কাজ করিয়েছিলেন, যেখান থেকে বলতে গেলে জ্যাঠাইমা ওকে জোর করেই নিয়ে এসেছিলেন। আমরা জ্যাঠাইমার সংসারে মানুষ হবো খালা খালুর এটা পছন্দ হচ্ছিলো না। বাবার বিয়ের ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহের এটাও ছিলো একটা কারণ।

জেঠিমা মুখে বলেছিলেন বটে নতুন মা এলে আমাদের আলাদাভাবে যত্ন নিতে পারবে, এত বড় সংসারে তিনি কারও ওপর আলাদা নজর দিতে পারেন না। পরে বুঝেছি বাবার এ বিয়ে তিনিও মন থেকে মেনে নেননি। আমাদের তিন ভাইয়ের ওপর ওঁর আলাদা টান ছিলো, বিশেষ করে বড় ভাই আর ছোট ভাইর জন্য। বড় ভাই হওয়ার পর মা অনেক দিন অসুস্থ ছিলেন। ভাইয়া জ্যাঠাইমার বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। ছোড়দি আর ভাইয়া ছিলো এক বয়সী। খালার ওখান থেকে বাবলুকে এনে ওকে বেশ কিছু দিন নিজের কাছে রেখেছিলেন জ্যাঠাইমা। তখন বাবলু জ্যাঠাইমার কানে দুল দেখে ওটা নেয়ার জন্য এমনই জেদ ধরেছিলো যে, ওটা জোর করে নিতে গিয়ে জ্যাঠাইমার কান ছিঁড়ে ফেলেছিলো। সেই থেকে জ্যাঠাইমা আর কানে দুল পরতে পারেননি। এ নিয়ে রাগ হওয়ার বদলে উল্টো ওর ওপর বেশি মায়া পড়ে গিয়েছিলো জ্যাঠাইমার। ছোট বেলায় রোগা পাতলা বাবলুর চেহারাও ছিলো মায়াকাড়া। বাবার বিয়ের ব্যাপারে জ্যাঠাইমার ভয় ছিলো, আবার না নতুন কোন ঝামেলা দেখা দেয়। আমাদের সৎ দাদীর অভিজ্ঞতা জ্যাঠাইমা কোনো দিন ভুলতে পারেননি।

জ্যাঠাইমার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিলো বন্ধুত্বপূর্ণ। তাঁরা দুজন ছিলেন এক বয়সী। এগারো বছর বয়সে আমাদের বাড়ির বউ হয়ে এসে সৎ শ্বাশুড়ির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন তিনি একা চোখের পানি ফেলতেন, বাবা ছিলেন তাঁর একমাত্র সঙ্গী। কুমারটুলির বাড়িতেও দেখেছি বাবার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তিনি আলাদা নজর রাখতেন। সেই জ্যাঠাইমা যখন বিয়েতে অমত করলেন না, বাবা বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলেন।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাবা বিয়ের বাজার কররেন। গয়না তো মারই ছিলো, অর্ধেক রেখে দিলেন ছেলের বউদের জন্য, বাকিটা নতুন মাকে দেয়া হলো। বাবার বিয়েতে আমি বরযাত্রী ছিলাম, ভাইয়া যায়নি। সিদ্দিক বাজারে এক বাড়িতে বিয়ে হয়েছিলো। বাড়িতে ঢোকার পর পাত্রীপক্ষের এক মহিলা আদর করে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন—'ভেতরে চলো, নতুন মাকে দেখবে', বলে।

বাবার কেনা হালকা গোলাপি রঙের টিস্যু শাড়ি পরে বউ সেজে যিনি বসেছিলেন তাঁকে প্রথম দেখায় আমার মোটেই পছন্দ হয় নি। না, দেখতে খারাপ ছিলেন না।

গায়ের রঙ ফর্শা, মুখটা সামান্য লম্বা, পাতলা খাড়া নাক, যে কেউ তাঁকে সুন্দরীই বলবে। তারপরও মা'র চেহারার সঙ্গে মেলাতে গিয়েই হোঁচট খেলাম। আমাদের মা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। মেলাতে গিয়ে প্রথমেই যেটা অপছন্দ হলো সেটা নতুন মায়ের চোখ। আমার মা'র চোখ ছিলো বড় আর ভাসা ভাসা। নতুন মার চোখ ছোট, সামান্য ভেতরে ঢোকানো। তাঁর বয়সও একটু বেশি ছিলো। আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো, একটা ছেলেও ছিলো, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়।

পছন্দ না হলেও একজন আমাকে নিয়ে নতুন মার কোলের পাশে বসিয়ে দিলো। তিনি আমাকে আদর করলেন। নাম টাম জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর সম্পর্কে ভাইয়া যেরকম ভীতিকর বর্ণনা দিয়েছিলো সেরকম কিছুই মনে হলো না। সেই রাতে মনে আছে বাবা আর নতুন মার মাঝখানে ঘুমিয়েছিলাম আমি। বাবলু ছিলো জ্যাঠাইমার কাছে। ভাইয়া আলাদা ঘরে থাকতো। কুমারটুলির বাড়িতে এসে প্রথম দিনই সবচেয়ে সুন্দর ঘরটা ভাইয়া দখল করেছিলো একা থাকবে বলে। বউ হয়ে বাড়িতে ঢোকার পর জ্যাঠাইমা তাঁর নতুন জা'কে বরণ করে ঘরে নিয়ে গেলেন। অনেক বলেও কেউ ভাইয়াকে নতুন মার ধারে কাছে আনতে পারলো না।

আমাদের মায়ের জায়গা আর কেউ নেবে, মায়ের শাড়ি গয়না পরে আর কেউ আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে, মা হতে চাইবে— ভাইয়া এটা কখনও মেনে নেয়নি। ভাইয়ার এই মনোভাব বাবলুর ভেতরও ছিলো।

স্কুলের নতুন বন্ধুরা

ক্লাস থ্রি তে ওঠার পর গভীর বন্ধুত্ব হলো ফারুখের সঙ্গে। তারপর গেন্ডারিয়ার জহির আর ঋষিকেশ দাস রোডের বিজনের সঙ্গে। ইনফ্যান্ট থেকে সবাই এক সঙ্গে পড়লেও কারও সঙ্গে আলাদা কোনো সম্পর্ক ছিলো না। সেই বয়সের বন্ধু মানে টিফিনের ভাগ দেয়া, আলাদা কোথাও বসে গল্প করা, খেলার সময় পার্টনার হওয়া, অন্য কারও সঙ্গে ঝগড়া হলে পক্ষ নেয়া এইসব। ফারুখ আর জহিরের বাড়ি ছিলো কাছাকাছি, এক সঙ্গে বাড়ি ফিরতো ওরা। তাই আগে থেকেই ওদের বন্ধুত্ব ছিলো।

আমাদের ক্লাসের লুৎফুলও থাকতো গেন্ডারিয়ায়। লেখাপড়ায় বেশি ভালো না হলেও মারপিট করতে ওস্তাদ ছিলো। শুনলাম কি নিয়ে যেন ফারুখের সঙ্গে লুৎফুলের খুব ঝগড়া হয়েছে, বলেছে বাড়ি ফেরার পথে লুৎফুল ওকে মারবে। শুনে আমার ভারি রাগ হলো। লুৎফুলের ছিলো মারফুটে চেহারা, আর ফারুখ বলতে গেলে দেবদূতের মতো সুন্দর। কেউ ওকে মারবে এটা পছন্দ হলো না। বললাম, 'ছুটির পর আমি তোর সঙ্গে থাকবো, দেখি কী করে মারে।'

বিজন আমার পাশে বসতো। ফারুখের বিপদের কথা ওকেও বললাম। বিজনও ফারুখের পক্ষ নিলো। এমনি করে আরও চার পাঁচজনকে জুটিয়ে ফেললাম। লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম বলে অন্যরা তখন থেকে বেশ মান্যগণ্য করতো। ছুটির পর সবাই দল বেঁধে ফারুখকে ওর বাসায় পৌঁছে দিলাম। পথে কারও টিকির নাগালও পেলাম না। লুৎফুলরা নাকি কাঠের পুলের কাছেই ছিলো। ফারুখের বড় দল দেখে হামলা করার সাহস হয়নি।

ক্লাসে কারও সঙ্গে ঝগড়া হলে বেশির ভাগ ছেলে দুই দলে ভাগ হয়ে যেতো। লুৎফুলের দলে ছিলো যারা পেছনের বেঞ্চে বসতো তারা। ভালো ছেলেরা আর যাদের বয়স কম তারা বসতো সামনের দিকে। বড়লোকদের ছেলেরা যার যেখানে খুশি

বসতো। পেছনে যারা বসতো তাদের সুবিধে ছিলো। কাগজের রকেট নয় গুলতি বানিয়ে পেছন থেকে মাথায় ছুঁড়ে মারতো, টিচার টের পেতেন না। মারার সময়েও মুখখানা এমন নিরীহ বানিয়ে রাখতো যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। সামনের বেঞ্চের কেউ পেছনে তাকাতে গেলেই টিচারের ধমক খেতে হতো। তাছাড়া সামনে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলে পেছনের অত ছেলের ভেতর কাগজের গুলতি কে ছুঁড়ছে সেটা বোঝার কোনো উপায় ছিলো না। দয়াপরবশ হয়ে পেছনের কোনো ভালো ছেলে যদি বলে দিতো কে মেরেছে তখন একটা ব্যবস্থা নেয়া যেতো। নইলে এসব মার চুপচাপ হজম করতে হতো।

দলগত বিরোধটা যখন বেশি বাড়তো তখন শুরু হতো উল্টো নামে ডাকা। লুৎফুলকে যেমন তার 'শত্রুপক্ষ' ডাকতো 'লফুৎলু' বলে। জাফর হয়ে যেতো 'রফজা', মেহেদী হয়ে যেতো 'দীহেমে'। আমার নামটা বড় হওয়াতে ওরা সুবিধে করতে পারলো না, তবে ফারুখকে ডাকা শুরু করেছিলো করুফা বলে। ওদের সামনে কিছু না বললেও ছুটির পর এ নিয়ে ফারুখের সে কি হাসি! কোনো রকমে হাসি চেপে বললো, 'আমার নাম ওল্টালে হবে খরুফা, আর ওরা বলে কিনা করুফা! হিঃ হিঃ হিঃ!' লুৎফুলদের এ ধরনের অজ্ঞতায় আমরাও ফারুকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসেছিলাম।

থ্রিতে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হলো শাহেদ আর ইউসুফ। শাহেদের বাবা বড় সরকারী চাকুরে আর ইউসুফ ছিলো পুরোনো ঢাকার বিখ্যাত কাদের সর্দারের নাতি। দু'জনই অসম্ভব মেধাবী। ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষার ফল বেরোবার পর দেখা গেলো শাহেদ ফার্স্ট হয়েছে আর ইউসুফ হয়েছে সেকেন্ড। সেই থেকে ক্লাস টেন অব্দি এই প্লেস দুটো ওদের মৌরসিপাট্টা হয়ে গিয়েছিলো, আমি আর কখনও থার্ডের ওপরে উঠতে পারিনি। প্লেস নিয়ে শাহেদ আর ইউসুফের ভেতর সূক্ষ্ম রেষারেষি থাকলেও ওদের দু'জনের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো। শুধু লেখাপড়ায় নয়, শাহেদ দেখতেও ছিলো ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দর ছেলে, পোষাক পরিচ্ছদেও সব সময় পরিপাটি থাকতো।

আমরা মার্বেল খেলে, লাট্টু খেলে টিফিন পিরিয়ড শেষ হওয়ার আগে ধুলো মেখে প্যান্ট শার্টের রঙ পাল্টে ফেলতাম, শাহেদ এসব থেকে দূরে থাকতো। বাবার বিয়ের আগে নিজের জামা কাপড় নিজেই ধুতাম, এমনকি ভাইয়ার যেসব কাপড় লন্ড্রিতে যেতো না সেগুলোও আমাকে ধুতে হতো। নতুন মা আসার পর তিনিই আমাদের জামা কাপড় ধুয়ে ইস্তিরি করে দিতেন। ছুটির দিনে আমাকে আর বাবলুকে কুয়োতলায় নিয়ে সারা গা ভালো করে রগড়ে গোসল করিয়ে দিতেন। ভাইয়া তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতো না। বরং সুযোগ পেলেই বলতো, 'যদি শুনি মা ডেকেছিস, মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেবো।'

নতুন মা চাইতেন আমরা তাঁকে মা বলে ডাকি। ভাইয়ার ভয় ছিলো, আর এক ধরনের আড়ষ্টতাও ছিলো, তাই ওঁকে কখনও সেভাবে মা ডাকা হয়নি। একেবারে যে ডাকিনি তা নয়, সিক্স সেভেনে ওঠার পর ভাইয়ার আড়ালে ওঁকে মা ডাকতাম। বলা

বাহুল্য এতে করে মাছ বা মাংসের টুকরো আমার পাতে এক আধখানা বেশি পড়তো। খাওয়ার লোভে নয়, তাঁকে আমার মনে হতো একজন দুঃখী মহিলা। তাঁর একটা ছেলে ছিলো, সে থাকতো তার বাবার কাছে। তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন ছেলেকে আমাদের কাছে এনে রাখতে। ওর নাম ছিলো পারভেজ। মাঝে মাঝে মা'র কাছে এসে থাকতো। নতুন মাকে খুশি করার জন্য আমি ওকে ডাকতাম পারভেজ ভাইয়া বলে। রাতে ঘুমোতোও আমার সঙ্গে। আমাকে খুব আদর করতো। ভাইয়া আবার ওকে পছন্দ করতো না। ইচ্ছে মতো খাটিয়ে মারতো—'পারভেজ, আমার জুতো পালিশ করে দে,' 'পারভেজ, আমার প্যান্ট ইস্তিরি করে দে' — এমনি সব ফরমাশ লেগেই থাকতো। পারভেজও আমার মতো ভাইয়াকে ভীষণ ভয় পেতো।

আমি যখন ক্লাস ফাইভে তখন পারভজকে এনে আমাদের স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো। ফেণীতে ওর বাবার কাছে থাকতে নাইনে পড়তো, আমাদের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় ও সেভেনের ওপরে চান্স পেলো না। হাতের লেখা মুক্তোর মতো হলেও পারভেজ ইংরেজিতে কাঁচা ছিলো। ফার্স্ট টার্মে তো বেচারা ইংরেজিতে ফেলই করে বসলো। এই ফেল কারার জন্য ভাইয়ার মারও খেলো খুব। রাতে আমার পাশে শুয়ে ওর সে কি কান্না। বলে 'আমি আর এখানে থাকবো না। ভাইয়া আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।' অনেক বলে টলে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে আদর করে ওর কান্না থামাতে হয়েছিলো। বয়সে বড় হলেও পারভেজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো বন্ধুর মতো।

ক্লাস ফাইভ-এ ওঠার পর বন্ধুত্ব হলো শেখরের সঙ্গে। শেখরের বাবা ছিলো ডাক্তার, থাকতো দক্ষিণ মৈষন্ডিতে। বাংলায় আমার চেয়ে অনেক বেশি নম্বর পেয়েছিলো বলে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিলো। দেখতেও ছিলো ভারি সুন্দর। আরও একটা কারণে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব গভীর হয়েছিলো, সেটা হচ্ছে আমাদের এক ধনী সহপাঠীর মন্তব্য। ফার্স্ট টার্ম নাকি সেকেন্ড টার্ম পরীক্ষায় বাংলায় সবার চেয়ে বেশি নম্বর পাওয়াতে ইদ্রিস স্যার ওর লেখার খুব প্রশংসা করেছিলেন। ক্লাসে ওর পরীক্ষার খাতা থেকে রচনা লেখা পড়েও শুনিয়েছিলেন। মুগ্ধ হওয়ার মতোই লেখা। হাতের লেখাও ভারি সুন্দর। আনোয়ার টিফিনে মন্তব্য করলো, 'এই রচনা ও নিজে বানিয়ে লেখেনি, নির্ঘাত ওর বাপ লিখে দিয়েছে।' তারপর বললো, 'রোজ এক জামা পরে স্কুলে আসে, তার আবার ফুটানি কতো!'

শেখর এমনিতে একটু অহংকারী স্বভাবের ছিলো। ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতো না। আনোয়ারের কথা শুনে শেখরকে বললাম, 'তুমি রোজ এক জামা পরে স্কুলে আসো কেন? আর জামা নেই?'

শুনে শেখর খুব দুঃখ পেলো। বললো, 'আনোয়ার বললো আর তুমি বিশ্বাস করলে? এই রঙ আর এই কাপড়ের জামা আমার পছন্দ বলে বাবা এক সঙ্গে চারটা জামা বানিয়ে দিয়েছে। দেখতে চাইলে আনোয়ারকে বোলো আমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখতে।'

শেখরের জামা অবশ্য দামী কাপড়েরই ছিলো। হালকা গোলাপি রঙের ক্রেপ সিল্কের। ওকে মানাতোও বেশ।

ক্লাস সিক্স-এ ওঠার পর শেখরের অহংকারী স্বভাবের জন্য ক্লাসে একেবারেই একঘরে হয়ে গেলো। আমি ছাড়া ওর আর কোনো বন্ধু ছিলো না। একদিন ক্লাসে এসে দেখি বোর্ডে কে লিখে রেখেছে *শেখর+ইন্দ্রা।*

এ ধরনের লেখা যে অশোভন এটা আমাদের তখনই জানা ছিলো। যেই লিখুক শেখরকে খোঁচাবার জন্য লিখেছে। শেখর ক্লাসে ঢুকে লেখা পড়ে রেগে মেগে একাকার—'কে এ কথা লিখেছে, সাহস থাকলে সামনে এসে দাঁড়াও।' রাগে ও রীতিমতো কাঁপছিলো।

আমি তাড়াতাড়ি বোর্ডের লেখাটা মুছে ওকে শান্ত করলাম—'যেই লিখুক সে কাপুরুষ। কখনও তোমার সামনে আসবে না।'

পরে শুনলাম ব্যাক বেঞ্চাররা বলাবলি করছে শেখর নাকি ইন্দ্রা নামের কোন মেয়েকে ভালোবাসে। কে নাকি ইন্দ্রার চিঠি দেখেছে শেখরের খাতার ভেতর। আরও সব খারাপ খারাপ কথা। একদিন ছুটির পর শেখরকে বললাম, 'ইন্দ্রা কে সত্যি করে বলবে?'

'ইন্দ্রা নয় ইন্দ্রানী, আমার ছোট বোন। বাসায় চলো, পরিচয় করিয়ে দেবো।'

শেখরের সঙ্গে ওদের বাসায় গেলাম। শেখর ওর ক্লাস ফোর-এ পড়া বোনকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলো। দারুণ সুন্দর' দেখতে, দেব সাহিত্য কুটিরের গল্পের বইয়ে আঁকা ছবির মতো। শেখরের মাও এলেন। দেখে মনে হলো দুর্গা প্রতিমা বুঝি প্রাণ পেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মিষ্টি খেতে দিলেন, বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলেন, ছোট বেলায় মা মারা গেছেন শুনে দুঃখও করলেন। বললেন, 'যখনই ইচ্ছে করবে শেখরের সঙ্গে চলে আসবে।'

ইন্দ্রানী অবশ্য কোনো কথা বলেনি। মনে হয় শেখরের মতো সেও অহংকারী স্বভাবের ছিলো। শেখরকে বাড়ি ফেরার পথে বললাম, 'এসব নোংরা কথা বন্ধ করা দরকার। কালই ইদ্রিস স্যারকে বলবো।'

বাংলার ইদ্রিস স্যার শেখরকে খুব পছন্দ করতেন। ও রাজী হলো না। বললো, 'স্যারকে বললে ক্লাসের সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করবে। জানোই তো, ক্লাসে আমাকে কেউ পছন্দ করে না।'

শেখরের গানের গলা ছিলো খুব মিষ্টি। ছুটির পর স্কুল যখন ফাঁকা হয়ে যেতো ক্লাসে বসে শেখরকে বলতাম, 'একটা গান গাও।'

শেখর গাইতো, 'তব বিজয় মুকুট, আজকে দেখি, সূর্যরাগে ঝলমল।' কিংবা 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে, সাত সাগর আর তের নদীর পারে . . . ।' সবই সুচিত্রা উত্তমের সিনেমার —তখনকার হিট গান। শুনতে ভারি ভালো লাগতো।

গরমের ছুটির পর ক্লাসে এসে শুনি শেখররা নাকি ইন্ডিয়া চলে গেছে। আর আসবে না। কথাটা বিশ্বাস হলো না। ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি তালা বন্ধ। তারপর বহু দিন অপেক্ষা করেছি। ভেবেছি শেখররা ফিরে আসবে। ফিরে না আসুক অন্তত একটা চিঠি লিখবে। শেখরের সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হয়নি। বন্ধু বিচ্ছেদের কষ্ট সেটাই ছিলো

জীবনে প্রথম। আজও শেখরের চেহারা চোখের সামনে ভাসে, একমাথা কোকড়া চুল, বড় বড় চোখ, ফর্শা একহারা চেহারা— জানি না এখন ও কোথায়।

ক্লাস সিক্স সেভেনে থাকতে দারুণ বন্ধুত্ব ছিলো মৃণালের সঙ্গে। থাকতো মিটফোর্ডে, বাবার ওষুধের দোকান ছিলো। হালকা পাতলা গড়নের, চোখগুলো ছিলো দারুণ মায়াকাড়া। আমার অসম্ভব রকমের বাধ্য ছিলো, বলতে গেলে এক রকম ভক্তই ছিলো। আমার সব কিছু ছিলো ওর কাছে দারুণ বিস্ময়ের। ফারুখ, জাফর, তওফিক— আরও যারা প্রিয় বন্ধু ছিলো স্কুলে অনেক সময় ওদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, বহুদিন কথা বলা বন্ধ থেকেছে। আড়ি দিয়ে পরে অবশ্য ভাব নিয়েছি। কিন্তু মৃণালের সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া হয়নি। কারও সঙ্গে ঝগড়া করা ওর স্বভাবের বাইরে ছিলো। স্কুল ছুটির পর আমরা এক সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম। আমাদের দু'জনের একটা মজার খেলা ছিলো—রাস্তা আবিষ্কার করা। কত নতুন আর বিচিত্র পথে বাড়ি যাওয়া যেতো এটা আমরা আবিষ্কার করতাম।

সোজা রাস্তাতো একটাই— পটুয়াটুলি, সদরঘাট, ভিক্টোরিয়া পার্ক হয়ে লক্ষ্মীবাজার যাওয়া। কোনোদিন আমরা শাঁখারি বাজার হয়ে বাড়ি ফিরতাম। কোনোদিন রমাকান্ত নন্দী লেন, কখনও সিম্পসন রোড হয়ে বুড়িগঙ্গার পাড় ধরে। কখনও জগন্নাথ কলেজের ভেতর দিয়ে নারায়ণগঞ্জের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গিয়ে উঠতাম। ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে ছিলো এই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। রাস্তা যত দুর্গম আর অচেনা হতো তত বেশি আমরা রোমাঞ্চিত হতাম।

মিটফোর্ড যাওয়ার পথে পড়তো আমাদের বাড়ি। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে মৃণাল ইসলামপুর, বাবু বাজার হয়ে একা বাড়ি ফিরতো। অনেক সময় বাড়িতে বই খাতা রেখে মৃণালকে বলতাম, 'চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

মৃণালদের বাড়ির ছাদে বসে গল্প করতে খুব ভালো লাগতো। মস্ত বড় ছাদ ছিলো, দক্ষিণ দিকে দাঁড়ালে ছবির মতো বুড়িগঙ্গা নদী দেখা যেতো। তখন কী সুন্দরই না ছিলো এই নদী। মাঝে মাঝে একটা দুটো লঞ্চ কিংবা স্টীমার চলতো। পাল তোলা নৌকা চলতো। নদীর ওপারে জিঞ্জিরায় বড় বড় বাঁশের দোকান ছিলো। নদীর এপার থেকে সব পরিষ্কার দেখা যেতো।

মৃণালকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলে ওর মা না খাইয়ে ছাড়তেন না। বন্ধুদের মায়েরা যখন শুনতো আমার মা নেই, বাবা আবার বিয়ে করেছেন— তাঁদের চোখ ছলছল করতো। আমার ওপর তাঁদের স্নেহমমতাও বেড়ে যেতো। আমিও বলতাম না আমাদের নতুন মা যে মোটেই ঠাকুরমার ঝুলির সৎমাদের মতো নয়।

মৃণালের সঙ্গে রক্তের বন্ধুত্ব ছিলো। ব্লেড দিয়ে হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দু'জনের রক্ত মিশিয়ে বন্ধুত্ব হয়েছিলো, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম একজন আরেকজনকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। ক্লাস এইটে ওঠার পর ঢাকায় একবার রায়ট লেগেছিলো। সেবার এ্যানুয়াল পরীক্ষার পর মৃণালরা আমাকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে চলে গেলো। কলকাতা না অন্য কোথায় গিয়েছে কিছুই জানি না। মৃণালের সঙ্গে আর কখনও দেখা

হয়নি। এবার বইমেলার জন্য 'আলোর পাখি'রা উপন্যাস লিখতে গিয়ে বার বার মৃণালের কথা মনে হচ্ছিলো।

বন্ধু ছিলে বিজনও। ক্লাস সেভেনে না এইটে এ্যানুয়াল পরীক্ষায় ফল বেরোবার পর দেখা গেলো থার্ড থেকে আমি সিক্সথ হয়েছি, বিজন দশেরও নিচে। আমরা দু'জন মনের দুঃখে বকুল তলায় বসে রইলাম। ঠিক করলাম আর বাড়িমুখো হবো না। রেজাল্ট নিয়ে ছেলেরা সব বাড়ি চলে গেলো। সারা স্কুল খাঁ খাঁ করছে, আমি আর বিজন বসে আছি বকুল তলায়। ক্ষিদে পেলে পাকা বকুল ফল কুড়িয়ে খাচ্ছি, পানি খেয়ে পেট ভরাচ্ছি আর ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত হয়তো কোথাও চলেই যেতাম, বিকেলে ভাইয়া এসে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাড়ি নিয়ে গেলো। বিজনও মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে বাড়ি ফিরলো।

সেদিন বিজন আর আমি যদি বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম তাহলে কী হতো? এ নিয়ে পরে ভেবেছি। শেষ অব্দি একটা উপন্যাসই লিখে ফেললাম 'অন্যরকম আটদিন' নামে। উপন্যাস লিখতে গেলে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশেল দিতে হয়। যেমন উপন্যাসের দুই বন্ধু ফেল করতে করতে কোনো রকমে বেঁচে গেছে, আমাদের পরীক্ষার ফল অতটা খারাপ ছিলো না। উপন্যাসের দুই বন্ধু তুখোড় ফুটবল খেলোয়াড়, দেখতেও সুন্দর—আমি আর বিজন যা ছিলাম না। বাকি সবই কল্পনা, সত্যি যেটুকু সেটুকু বইয়ের ভূমিকায় বলা আছে।

সেবার না পালালেও কলেজে উঠে ফারুখের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিনা পাসপোর্টে কলকাতা গিয়েছিলাম। নকশালদের গোপন সব কাগজপত্র সঙ্গে আনতে গিয়ে বর্ডারে ধরাও পড়ে গিয়েছিলাম। জেল–টেলও খাটতে হয়েছিলো, সে এক দারুণ রোমহর্ষক ঘটনা! তবে সেটা স্কুল জীবনের বাইরে বলে এখানে আর বলছি না। স্কুলের বন্ধুদের ভেতর সবচেয়ে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো ফারুখের সঙ্গে। অথচ এমনই তাজ্জবের কথা, মাত্র কদিন আগে এক আর্ট গ্যালারিতে ফারুখের সঙ্গে দেখা হলো— ওকে প্রথম চিনতেই পারলাম না। চেনার কথাও নয়, গত পঁচিশ বছর ধরে ও আমেরিকায় আছে, বিয়েও করেছে এক আমেরিকান মেয়েকে। ওর থাকার কথা স্যানফ্রান্সিসকো, ও কিভাবে বনানীর লা গ্যালারিতে আসবে? আমাকে দেখে যে সুদর্শন মানুষটি মিটিমিটি হাসছিলো সে যে আমার স্কুল জীবনের প্রাণের বন্ধু এটা আমার একেবারেই ধারণার বাইরে ছিলো। ও গ্যালারিতে ছবি দেখতে এসেছিলো টেলিভিশনের প্রযোজক ম হামিদের সঙ্গে। ঢাকা যে এসেছে তাও জানি না। আমি হামিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ফারুখের হাসির জবাব না দেয়াতে ও মনক্ষুণ্ন হয়ে হামিদকে বললো, 'আমি দেখতে চাই নাম না বললে ও আমাকে চিনতে পারে কি না!'

কথা বলার ধরন দেখেই বুঝলাম ও কে। গ্যালারির সব গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের অবাক করে ওকে বুকে জুড়িয়ে ধরে বললাম, 'তুই ফারুখ! ঢাকা এসে আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিসনি!'

ফারুখ বললো, 'তোকে সারপ্রাইজ দেবো বলে জানাইনি।' এই বলে হামিদের

কাছে অভিযোগ করলো, 'আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটিই আমাকে চিনতে পারলো না। ও কী রকম বদলে গেছে!'

ফারুখকে আমি তখন বলতে পারিনি আমি এতটুকু বদলাইনি। যখন থেকে ওর সঙ্গে পরিচয়, সব কথা আমার মনে আছে। কতদিন ফারুখের গেন্ডারিয়ার বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে কাটিয়েছি তার কোনো হিসেব নেই। ক্লাস নাইনে উঠে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ফাঁকি দিয়ে গুলিস্তানে দুপুরের স্পেশাল শোতে ওর সঙ্গে কত ছবি দেখেছি তারও হিসেব নেই। বাড়ি থেকে পালিয়ে যে কলকাতা গেলাম তাও তো সাতাশ বছর আগের কথা। সব কথা পষ্ট মনে আছে। জেল থেকে জামিনে বেরিয়ে তখন প্রতি মাসে ঝিনাইদহের কোর্টে হাজিরা দেয়া, যশোরে ফারুখদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকা— কোনো কিছুই ভুলিনি।

আমি যখন ক্লাস টেন-এ উঠে লেখালেখি শুরু করলাম তখন আমাকে নিয়ে ফারুখের সে কি গর্ব! ক্লাস টেন-এ ওঠার পর আমাদের মিশনারি স্কুলের চিরকালের নিয়ম ভেঙে স্ট্রাইক করলাম— সবার আগে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো ফারুখ। ও যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার মাঝখানে আমেরিকা চলে যায় তখন ছেলেমানুষের মতো কেঁদেছিলাম। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন শুনলো আমি আর মেজদা কলকাতায় প্রচন্ড অর্থকষ্টে আছি, দু' দফায় আমাদের জন্য ও চারশ ডলার পাঠিয়েছিলো। ফারুখকে আমার সেদিন গ্যালারিতে বলা হয়নি— আমি কিছুই যে ভুলিনি। ফারুখ কেন, জহির, শাহেদ, ইউসুফ, বিজন, দিলীপ, শংকর, প্যাট্রিক, কেনেথ, আতাউল্লা, তওফিক, জাফর, শাহরুখ, শাহাদত, বখতিয়ার, খালেদ, মোখলেস, বাবু, সালেহ, আমীর আলী, মাসুক, মোশাররফ, লুৎফুল, আনোয়ার, রফিক, আনসারী, রতন, ভুইয়া, মৃণাল, তোবারক, আলী আহসান, ইউনুস, ছোট ইউসুফ, মাহবুব, আমীন, বেদানন্দ, টুলু, মেহেদী, ইশরাক, ইতরাত, নজমুল — কাউকেই ভুলিনি।

বালকবেলার বন্ধুদের কখনও ভোলা যায় না।

দুষ্টুমির রকমফের

ফোর থেকে যত ওপরে উঠেছি বন্ধুর সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছে। খালেদ ছিলো আরেক বন্ধু যে আমাকে দাবা খেলা শিখিয়েছিলো। ক্লাস সিক্সে উঠে ও ক্যাডেট কলেজে চলে যায়। স্কুলের কাছেই ছিলো ওর বাড়ি, সময় পেলেই চলে যেতাম সেখানে। আরেকজন ছিলো ইউনুস, স্কুলের যে কোন ফাংশানে গান গাইতো, আমার আগেই স্কুল ম্যাগাজিনে গল্প লেখা শুরু করেছিলো। সুন্দর আঁকতেও পারতো। ক্লাস সেভেন এইটে থাকতেই সিনেমার নায়কদের মতো ব্যাকব্রাশ করে চুল আঁচড়াতো, চেহারাও নায়ক টাইপের ছিলো, দুষ্টুমিতেও ছিলো পাকা। থাকতো নন্দলাল দত্ত লেন–এ। নিখিল স্যার বলতেন লক্ষ্মী বাজারের মোড়ল।

সিক্স–এ ওঠার পর দুষ্টুমির সঙ্গী হলো ভূতের গলির জাফর আর টিকাটুলির তওফিক। আমাদের মতো তওফিকদের সব ভাই সেন্ট গ্রেগরির ছাত্র ছিলো, ওর বড় ভাই আশফাকুস সামাদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, রংপুরের ভুরুঙ্গামারির যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ওর ছোট ভাই উলফৎ, তারও ছোট শওকি, আমার ছোট ভাইর মতোই ছিলো।

এখন যেখানে রাজাকার মওলানা মান্নানের 'ইনকেলাব' পত্রিকার অফিস সেখানেই ছিলো তওফিকদের সেকেলে চেহারার মাঝারি ধরনের চমৎকার দোতালা বাড়ি। বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর ছিলো মিষ্টির দোকান। দোকানের পেছনে মিষ্টি বানানো হতো।

ক্লাসে একদিন নিকোলাস স্যার গরম রসগোল্লা খাওয়ার এমন রসালো গল্প বলেছিলেন যে সবার জিভে পানি এসে গিয়েছিলো। স্যারের বর্ণনা শুনে মনে হয়েছিলো রসে ডোবানো গরম রসগোল্লার চেয়ে উপাদেয় খাবার বুঝি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

ছুটির পর তওফিক বললো, 'গরম রসগোল্লা খাবি?'

সবাই ওর ওপর হামলে পড়লো—'খাবো না মানে, কোথায়? কখন? শিগগির বল!'

তওফিক শুধু বললো, 'আমাদের বাড়িতে চল।'

আমরা দল বেঁধে তওফিকদের বাড়িতে এলাম। হল্লা করে সবাই একসঙ্গে ঢুকলে জানাজানি হয়ে যাবে, তাই একজন দু'জন করে গেরিলা কায়দায় চুপচাপ ওদের ছাদে উঠে গেলাম। কিছুক্ষণ পর মস্ত এক বাটিতে করে সত্যি সত্যি গরম রসগোল্লা এনে হাজির হলো তওফিক। কি করে যেন মিষ্টির দোকানের পেছন দিকের জানালা খুলে ভেতরে ঢোকার কায়দা বের করেছিলো। দু'জন সাহসী ছেলে সঙ্গে নিয়ে ঠিকই সের খানেক রসগোল্লা চুরি করে নিয়ে এসেছে। খেতে খেতে বললাম, 'হ্যাঁরে, দোকানদার যদি টের পেয়ে তোর মাকে বলে দেয়!'

তওফিকের মা ছিলেন আর্মানিটোলার আনন্দময়ী গার্লস স্কুলের জাঁদরেল হেডমিস্ট্রেস। আমরা সবাই তাঁকে ভয় পেতাম, যদিও আমাকে তিনি নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। ওর বাবার মতো নিপাট ভালোমানুষ আমি খুব কম দেখেছি। আমার আশঙ্কার কথা শুনে তওফিক আস্থার সঙ্গে জবাব দিলো, 'এরকম কয়েক বাটি আনলেও কেউ টের পাবে না। একেকটা কড়াইতে দুই তিন মণ মিষ্টি বানিয়ে রেখেছে।'

তখন আমাদের স্কুলে প্রায় প্রত্যেক বছরই পিকনিক হতো। ছাত্র শিক্ষক সবাই মিলে কখনও জয়দেবপুরের রাজবাড়ি, কখনও রাজেন্দ্রপুর, কখনও মৌচাক যেতাম পিকনিকে। একবার কী কারণে যেন আমরা পিকনিকে যাইনি। তওফিক বললো, 'চল আমরা নিজেরা পিকনিক করবো।'

'কোথায় করবি? টাকা কে দেবে?'

'সব ব্যবস্থা আমি করে তোদের খবর দেবো।' এই বলে ভূইয়া আর শাহাদতের সঙ্গে গোপন পরামর্শে বসলো তওফিক।

ভূইয়া আর শাহাদত দু'জনই বয়সে আমাদের চেয়ে বড়। ফারুখ আর লুৎফুলের ঝগড়া মিটে যাওয়ার পর ভূইয়া আর শাহাদতের দুটো বিবাদমান জোট হয়েছিলো। আমরা ছিলাম শাহাদতের দলে। পরে বুড়ো আঙ্গুল মিলিয়ে আইসক্রিম খেয়ে দুজনের দারুন ভাব! বয়সে বড় হওয়ার কারণে বড় ধরনের কোনো অপকর্ম করার আগে সবাই ওদের সঙ্গে পরামর্শ করতো। ওরাও নিজেদের নেতাগিরি উপভোগ করতো।

কদিন পর শুক্রবারের হাফ ছুটির দিনে দুপুর বেলা গোপীবাগের এক পোড়ো বাড়িতে পোলাও আর মোরগের মাংস দিয়ে দারুণ মজার পিকনিক খেলাম। পোলাওর চাল তওফিকদের বাড়ি থেকে চুরি করা, আর মোরগ অন্য বাড়ির। মোরগ ধরার বুদ্ধিটা ভূইয়ারই ছিলো। তওফিকদের বাড়ির একটা পোষা লড়ুইয়ে মোরগ বগলে নিয়ে ওরা গোপীবাগের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছে চার পাঁচজন মিলে। গোপীবাগ তখন খুবই নিরিবিলি এলাকা ছিলো। রাস্তায় যদি কোনো লড়ুইয়ে মোরগ চোখে পড়েছে—ব্যস তখনই নিজেদেরটা ছেড়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যেতো মোরগের লড়াই। লড়াই করার সময় মোরগের অন্যদিকে হুঁশ থাকে না। পেছন থেকে খপ করে

ধরতে কোনো অসুবিধে হতো না। এভাবে এ পাড়া ওপাড়া ঘুরে গোটা পাঁচেক মোরগ সংগ্রহ করা হয়েছিলো। ভূইয়ার রান্নার হাতও ছিলো চমৎকার। শাহাদতও ভালো রাঁধতে পারতো। কে জানে সেজন্যেই বোধহয় কয়েক বছর আগে ও সোনারগাঁও হোটেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছিলো।

জেঠুরা কায়েতটুলিতে বাড়ি কিনে সেখানে উঠে যাবার পর কুমারটুলির গোটা বাড়িতে আমরা ছাড়া আর কেউ ছিলো না। নিচের তলার বেশির ভাগ ঘর অন্ধকার আর স্যাঁতস্যাতে বলে অগলী সাহেবরাও অন্য বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। সে সময় বাড়িটার ওপর নজর পড়লো বাবাদের অফিসের এক বড় সাহেবের। তাঁর পুরো নাম বলছি না, এখানে তাঁকে ব সাহেব বলবো।

একদিন ব সাহেব বাবাকে ডেকে বললেন, 'আপনার ফ্যামিলি ছোট, নিচের তলায় তো থাকতে পারেন। ও বাড়ির ওপর তলাটা আমার খুব পছন্দ।' বাবা শুকনো মুখে তাঁকে বললেন, 'অফিস থেকে যদি আপনাকে ওপর তলা বরাদ্দ করে— থাকবেন সেখানে।'

কদিন পর আমাদের নিচে নেমে যেতে হলো। ব সাহেবরা ওপর তলায় এলেন। ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন, পোষ্য নিয়ে বিরাট পরিবার, নোংরাও বটে। ওপর তলা থেকে যখন তখন নিচের তলার যেখানে সেখানে ওরা আবর্জনা ফেলতো। নিচের তলায় তিনটা কামরা ভালোই ছিলো, বেশ আলো বাতাস আসতো, তবু ওপর তলায় থাকার মজাই আলাদা ছিলো। মনে মনে ঠিক করলাম এ বাড়ি থেকে ব সাহেবদের তাড়াতে হবে।

ব সাহেবের ছ সাত বছরের একটা ছেলে ছিলো, হ্যাংলা ল্যাগব্যাগে, ছোটবেলায় রিকেট হওয়াতে ওর একটা না একটা অসুখ লেগেই থাকতো। মেয়ে ছিলো গোটা তিনেক, দেখতে তো খ্যাংরা কাঠি, দেমাগে মাটিতে পা পড়তো না। নিয়ম ছিলো নিচের তলায় যারা থাকবে লন তারা ব্যবহার করবে। কদিন পর দেখি ব সাহেবের মেয়েরা লন-এ এসে ঘোরাফেরা করছে দলবল জুটিয়ে। একদিন তাঁর বড় মেয়ে আমাকে বলেই দিলো, 'বিকেলে আমরা যখন লন-এ থাকবো তোমরা কেউ সেখানে যাবে না।' আমি ভালো মানুষের মতো বললাম, 'ঠিক আছে আপা।'

পরদিন ওদের কাজের লোক রহমত এসে মাটি কোপাতে লাগলো। নাকি লন-এ তরকারির চাষ হবে। দেখে ভীষণ রাগ হলো। আমার তখন থেকেই বাগান করার শখ। কুমারটুলির বাড়িতে টবে প্রচুর ফুল আর বাহারি পাতার গাছ ছিলো। মাটি কোপাতে গিয়ে রহমত একটা ভাঙা ঘটি বের করলো। মওকা পেয়ে গেলাম। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'রহমত, এটা কী করেছো? আমাদের সবার সর্বনাশ হবে যে!'

ব সাহেরব বড় মেয়ে পুতুল দাঁড়িয়ে তদারকি করছিলো। ভুরু কুঁচকে বললো, 'কী হয়েছে?'

'সবাই টের পাবে! এই ঘটিগুলো জেঠু মাটিতে পুঁতে বাড়ি বন্ধ করেছিলেন।'

'বাড়ি বন্ধ মানে কী?'

'এখান থেকে জ্বীন তাড়াবার জন্য জেঠু বাড়ি বন্ধ করেছিলেন।'

'গুল মারার বুঝি জায়গা পাও না!'

কথা না বাড়িয়ে আমি সরে এলাম। তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে গেলো নিচের লন থেকে কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ে মারলাম ওপরের টানা বারান্দায়। একটা বোধহয় দরজার কাচেও লেগেছিলো। কাচ ভাঙার শব্দ হতেই আমি কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেলাম। ওপর তলায় ব সাহেবের ভয়ার্ত গলা শুনলাম 'কে, কে!'

পরদিন সন্ধ্যায় তাঁর বড় মেয়ে বললো, 'কাল পাড়ার কোনো পাজী লোক আমাদের বারান্দায় ঢিল ছুঁড়েছিলো।'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'রাতে এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে, তেমন লোক এ পাড়ায় নেই।'

'একথা বলছো কেন?'

কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'পাড়ার সবাই জানে রাতে এ বাড়ির ধারে কাছে এলে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।'

'অতো হেঁয়ালি করছো কেন? খুলে বলো না কী হয়!'

'জানেন না, এটা যে বালিয়াটির জমিদারদের অভিশপ্ত বাড়ি? এ বাড়িতে জমিদারদের দুটো নর্তকী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিলো।'

'তোমরা তো এতদিন ওপরে ছিলে। তোমাদের যে কিছু হয়নি?'

'হয়নি জেঠুর জন্য। জেঠু মস্ত কামেল পীর। তিনি জ্বীন পোষেন। সেজন্য আমাদের কেউ ঘাঁটায় না। কাল যদি রহমত কলমা পড়া ঘটি না তুলতো তাহলে হয়তো আপনারাও বেঁচে যেতেন।'

'বলো কী!' মেয়েটা এবার আমার কথা বিশ্বাস করলো।

'অগলী সাহেবদের জিজ্ঞেস করুন, ওঁরা কেন চলে গেলেন!'

কালো মুখ আরও কালো করে ব সাহেবের বড় মেয়ে ওপরে চলে গেলো। পরদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পর ওপরে ডাক পড়লো। ব সাহেবের গিন্নি কর্কশ গলায় বললেন, 'পুতুকে তুমি এসব কী বলেছো? এ বাড়িতে নাকি জ্বীন আছে?'

'আছেই তো! পাড়ার সবাই জানে। আপনাদের রহমতকে বলুন জিজ্ঞেস করে দেখতে।'

পাড়ার সবার জানার কথাটা মিথ্যে নয়। জেঠিমার কাকী বলার পর জেঠু যখন হুজুরদের দিয়ে বাড়ি বন্ধ করালেন তখন পাড়ায় এটা ভালো রকমই চাউর হয়েছিলো—এ বাড়িতে যে খবিস জ্বীন ভূত আছে। আমাদের গেট-এর সামনে যে বিহারী পান দোকানওয়ালা বসতো সে প্রায়ই খদ্দেরদের গল্প করতো, জেঠু কিভাবে এ বাড়ি থেকে খবিস জ্বীন তাড়িয়েছেন। বেশ খানিকটা রঙ মিশিয়ে বাড়ি বন্ধ করার ঘটনাটা ব গিন্নিকে বললাম।

শুনে চিন্তিত গলায় তিনি বললেন, 'তোমার জেঠুকে খবর দিলে তিনি আসবেন না?'

'জেঠু কাউকে জানতে দিতে চান না তাঁর যে পোষা জ্বীন আছে। বললে উল্টো রেগেযাবেন।'

পরদিন ব সাহেবরা বাড়িতে মিলাদ পড়ালেন। সারা রাত জিকির হলো। তার পরের রাতে আবার ওদের টানা বারান্দায় ঢিল পড়লো। পর পর কয়েক রাতই এ রকম হলো।

বাবা আমাকে বললেন, 'তুই নাকি ব সাহেবের বেগমকে ভয় দেখিয়েছিস?'

'ভয় কোথায় দেখালাম! জেঠু কিভাবে বাড়ি বন্ধ করে জ্বীন তাড়িয়েছেন সে কথা শুধুবলেছি।'

'ওরা খুব ভয় পেয়েছে।'

'ওরা ভয় পেলে আমরা কী করবো?'

ব সাহেবের ওপর বাবারও রাগ ছিলো। যে কারণে এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। নিচের তলায় আমি থাকতাম আলাদা ঘরে। ভাইয়া আলাদা ঘরে। বাবলু থাকতো বাবাদের সঙ্গে। ভাইয়ার ভীষণ ভূতের ভয় ছিলো, যে কারণে রাতে ঘর থেকে বেরুতো না। ছোট বেলা থেকে আমার ভূতের ভয় বলে কিছু ছিলো না। রাতের অন্ধকারে কালো চাদর মুড়ি দিয়ে লনে ঘোরাফেরা করতে কোনো অসুবিধে হতো না।

সুযোগ পেলেই ব সাহেবের মেয়েদের বলতাম, কত রাত আউট হাউসের ছাদে দেখেছি ধবধবে সাদা পোষাক পরা দুই বাঈজী বসে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। বাড়ি বন্ধ করার আগে আরও কত কী ঘটতো সে সবও ওদের বলতাম। ওই বয়সে ভূতের গল্প কম পড়িনি!

এর বোধহয় মাস খানেক পর ব সাহেবরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা আবার ওপর তলায় উঠে এলাম।

নতুন মার দূর সম্পর্কের এক বোনঝি আমাদের সঙ্গে থাকতো। নাম ছিলো দুলারি। আমার বছর দুয়েকের ছোট ছিলো, তবে আমাকে মান্যগণ্য করতো খুব। বাড়িতে কোনো অবাঞ্ছিত অতিথি এসে যদি যাবার নাম না করতেন রাতে আমি আর দুলারি জ্বীন সেজে ওদের অনেককে বাড়ি ছাড়া করেছি।

স্কুলে মেইন বিল্ডিং-এর দোতালায় সায়েন্স মিউজিয়ামে একটা কঙ্কাল ছিলো, কাচের আলমারির ভেতর ঝোলানো। একদিন আমাদের ফার্স্ট বয় শাহেদকে ভয় পাইয়ে দিলাম ওই কঙ্কাল দেখিয়ে। শুক্রবার দিন হাফ স্কুল। কী কারণে আমি আর শাহেদ স্কুলে থেকে গেছি। বোধহয় স্কাউটিঙের কোনো ব্যাপার ছিলো। হঠাৎ করেই মাথায় চাপলো শাহেদকে ভয় দেখাবো। বললাম, 'আমার সঙ্গে একটু ওপরে যাবি? সকালে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে ড্রইং খাতাটা ওখানে ফেলে এসেছি।'

ভালো ছেলেদের যতগুলো গুণ থাকা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো শাহেদের। দু সিড়ি টপকে উঠে ওর আগে আমি মিউজিয়ামে ঢুকলাম। শাহেদ তখনও সিড়ির ওপর। আমি ছিটকে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ভয় পাওয়া গলায় ওকে বললাম, 'শিগগির নিচে চল!'

শাহেদ থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'কেন?'

'কঙ্কালটা আলমারি থেকে বেরিয়ে একটা চেয়ারের ওপর বসে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই ওটা মাথা ঘুরিয়ে কটমট করে আমার দিকে তাকালো।'

'যাহ!' শাহেদের গলায় অবিশ্বাস।

'বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে দ্যাখ।'

'তুইও চল।'

'পাগল হয়েছিস? আমার অতো সাহস নেই।'

শাহেদ আমার কথা বিশ্বাস করে আর ওপরে উঠলো না। পরদিন ক্লাসে বললাম, 'কাল আমি আর শাহেদ কঙ্কালটাকে মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।'

'কী আবোল তাবোল বলছিস? সত্যি নাকি শাহেদ?' বন্ধুরা শাহেদের সমর্থন চাইলো।

শাহেদ মাথা নেড়ে সায় জানালো। যা বলার আমি বললাম। কদিন পর বিজন বললো সেও নাকি কঙ্কালটাকে মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। এরপর আরও কয়েকজন দেখলো।

বিজনদের দোষ নেই। বারো তেরো বছরের ছেলেরা অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ হয়। আমাদের এই দুষ্টুমির ঘটনা নিয়ে কলেজে উঠে 'পিয়ানো ভূতের কাণ্ড' নামে 'কচি ও কাঁচা'য় একটা গল্প লিখেছিলাম।

ক্লাস সিক্স–এ ওঠার পর তওফিক, জাফর, ফারুখ, আমি আর জহির একটা আর্ট স্টুডিও গঠন করেছিলাম। আমাদের কাজ ছিলো ক্লাসের সময় টিচারের চোখ ফাঁকি দিয়ে কার্টুন আঁকা। আইডিয়াটা এসেছিলো সুকুমার রায়ের খিচুড়ি কবিতা থেকে। নিখিল স্যার ক্লাসে খুব মজা করে সুকুমার রায়ের কবিতা পড়ে শোনাতেন। 'হাঁসজারু,' 'বকচ্ছপ' আর 'হাতিমি'র কথা শুনে আমরাও ক্লাসে আঁকা শুরু করে দিলাম। পুরো ছবির একটা অংশ একজন আঁকবে এটাই ছিলো নিয়ম। প্রথমে হয়তো একজন একটা মানুষের মুখ আঁকলো। আরেকজন ওটার মাথায় দুটো শিং লাগালো। আরেকজন নাকটাকে হাতির শুঁড় বানিয়ে দিলো। হাতের জায়গায় একজন দুটো পাখির ডানা বসিয়ে দিলো। শরীরটাকে এজন বানিয়ে দিলো সাপের মতো। তারপর সাপের লেজ পেঁচিয়ে ধরতো আরেক অদ্ভুত জিনিষকে। এভাবে ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত আঁকার খাতা এক হাত থেকে আরেক হাতে ঘুরতে থাকতো। ঘোরাটা অবশ্য স্টুডিওর সদস্যদের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রত্যেকেই নিজের এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী আঁকিয়ের সৃজন ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হতো, অতি কষ্টে হাসি চাপতো স্যারের বকুনি খাওয়ার ভয়ে। এই স্টুডিওর নাম ছিলো 'ফ্যাচকা আর্ট স্টুডিও।'

এসব শিল্পচর্চা রহমতউল্লা স্যারের ক্লাসে বেশি জমতো। তিনি আমাদের হাতের লেখা সুন্দর করার ক্লাস নিতেন। এটাকে বলা হতো পেনমেনশিপ ক্লাস।

আমেরিকান স্টাইলে ইংরেজি লেখা শেখানোর একটা বড় চার্ট ঝোলানো থাকতো এই ক্লাসে। কলম না তুলে তেরছা করে সোজা দাগ আর '*O*' এর মতো গোল করে

যেতে হতো রুলটানা খাতার পুরো লাইন জুড়ে। *a* থেকে *z* পর্যন্ত লিখতে হতো কলম না তুলে। লেখার স্পীড বাড়াবার জন্যই এটা করা হতো। ব্রাদাররা বলতেন যতবার তুমি লেখা থামিয়ে কলম তুলবে তত তোমার স্পীড কমে যাবে। ইংরেজি শব্দ যত বড় হোক না কেন এক টানে লিখতে হতো। বৃটিশ আর আমেরিকান স্টাইলের তফাৎ এভাবে বুঝিয়ে দিতেন আমাদের—বৃটিশরা সব কিছুতে স্লো আর আমেরিকানরা সব কিছুতে ফ্যাস্ট।

রহমতুল্লা স্যারের হাতের লেখা ছিলো চমৎকার। নিজের লেখায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। একটা প্যারাগ্রাফ বোর্ডে লিখে সেটা দশবার মকশো করার কথা বলে তিনি ক্লাসে একদফা ঘুমিয়ে নিতেন। আমরাও একবার কপি করেই স্টুডিওর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম।

রহমতউল্লা স্যারের ক্লাসে আরও দুষ্টুমি হতো। ক্লাস ফোরে না ফাইভে তিনি বাংলা দ্রুত পঠন পড়াতেন। বইয়ে কয়েকটা ছোট ছোট নাটক ছিলো। স্যার আমাদের রিডিং পড়তে বলতেন। আমাদের ভেতর কে যেন স্যারকে পরামর্শ দিলো একজন পুরো নাটক না পড়ে চরিত্রগুলো ভাগ করে পড়লে পড়াটা বেশি উপভোগ্য হবে।

পরামর্শটা স্যারের পছন্দ হলো। একগাল হেসে বললেন, 'কে কোন পার্ট পড়বা খাড়াও।' ক্লাসে ঢাকাইয়া উচ্চারণে কথা বলতেন তিনি। ক্লাসের কয়েকজন ছিলো যারা যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতে গিয়ে গোলমাল করতো, কিংবা কারও হয়তো কোনো মুদ্রাদোষ ছিলো। মজা করার জন্য আমরা ঠেলেঠুলে ওদের দাঁড় করিয়ে দিতাম। যাদের মুদ্রাদোষ থাকে তারা নিজেরাও পড়ার সময় বুঝতে পারে না কোথায় ভুল হচ্ছে।

একটা নাটক ছিলো শাহী দরবারের ঘটনা নিয়ে। চকবাজারের বাবু ছিলো খাস ঢাকাইয়া। খুবই বনেদি পরিবারের ছেলে, হেকিম হাবিবুর রহমানের আত্মীয়, বাংলা পড়তে গেলে ঢাকাইয়া টান চলে আসতো। ওকেই বানানো হলো বাদশাহ। নাটকের এক জায়গায় বাদশাহ খাজাঞ্চিকে ডাকছেন—'খাজাঞ্চি, খাজাঞ্চি, জলদি এসো।' বাবু খুব আবেগ দিয়ে বাদশাহর মতো ভরাট গলায় বললো, 'খানজানজি, খানজানজি জলদি আস।' 'স' উচ্চারণ করতো ইংরেজি 'S' এর মতো।

'খাজাঞ্চি'র বদলে 'খানজানজি' আর 'এসো'র বদলে 'আSঅ' শুনে ক্লাস সুদ্ধো সবাই হেসে খুন। বাবুর মতো রহমতউল্লা স্যারও বিস্মিত এবং বিরক্ত—'কী ওইচে! এত হাসনের কী ওইচে?' হাসি তবু থামে না। এরপর গর্জন করে উঠতেন রহমতউল্লা স্যার—'চোপ! দরলে হাড্ডি বাইঙ্গা ফালামু কইলাম!' অতি কষ্টে সবার হাসি থামতো।

তেমনিভাবে আমির আলীর ছিলো তোৎলানোর অভ্যাস। ওর সংলাপ বলাও কম হাসির ছিলো না। আমির আলী হয়তো কোনোরকমে বললো, 'তো-তো-তোমার এ-এ-এত্ত বড় সা-সা-সা-হস!' এর পর সংলাপ বলবে কেন্টু। সে যদিও তোৎলা নয়, জবাবে পড়তো —'হঃ-হঃ-হঃ-হুজুর, মাম্মাম্মাম্মাফ করে দেদেদেদেন।'

রহমতউল্লা স্যার মনে করতেন দুজনেই বুঝি বাঁদরামো করছে। কেন্টুর সঙ্গে সঙ্গে বেচারা আমির আলীও পিঠে ডাস্টারের বাড়ি খেতো।

এ ধরনের দুষ্টুমি যে নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে সেটা ক্লাস ফোর ফাইভের ছেলেরা বুঝতো না।

স্যারদের সঙ্গে বাঁদরামো করার ব্যাপারে কেন্টুর জুড়ি ছিলো না। একদিন ভৌমিক স্যারের হাতে মার খেয়ে পরদিন স্যারের ক্লাস শুরুর আগে টেবিলে জলবিছুটির গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখলো। ব্যস, চেয়ারে বসার মিনিট পাঁচেক পরই স্যার উসখুস করতে লাগলেন। দশ মিনিটে সারা শরীর খামচাতে লাগলেন। তারপর ক্লাস থেকে তীরের বেগে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন আর স্যার কোনো ক্লাস নিতে পারেননি। পরে শুনেছি কেন্টু গিয়ে স্যারের কাছে মাপ চেয়েছে।

স্যারদের অদ্ভুত সব খেতাব দেয়াও ছিলো ছেলেদের বাঁদরামোর একটা অংশ। গাঙ্গুলী রোগা পাতলা গড়নের ছিলেন বলে তাঁর নাম দেয়া হয়েছিলো 'ল্যাগব্যাগে স্যার।' আড়ালে তাকে 'উমবাচ্চু'ও ডাকা হতো। 'উমবাচ্চো' ছিলো স্যারের এক মুদ্রাদোষ। ক্লাসে বেশি গন্ডগোল হলে রেগে গিয়ে ক্লাসের এমাথা ওমাথা পায়চারি করতেন আর দাঁত কিড়মিড় করে বলতেন, 'উমবাচ্চো, বাজার পেইচিস বাজার, সূত্রাপুর আর রায়সাহেবের বাজার ---?'

শুভদারঞ্জন স্যারের মাথার ওপর ছোট্ট একটা টাক ছিলো। ওঁর নাম হয়ে গেলো 'স্টেডিয়াম স্যার।' ভৌমিক স্যার কাউকে ধমক দিতে গেলে বলতেন 'খাইছস আমার মুগুইরা কিল?' ওখান থেকে ওঁর নাম ছিলো 'মুগুইরা স্যার।' ইদ্রিস স্যার বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন বলে তাঁর নাম ছিলো 'শান্তিনিকেতন'। পোষাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত পরিপাটি থাকতেন বলে সিরাজুল হক স্যারের নাম ছিলো 'ফিটফাট স্যার।' পিডি কস্টা স্যারকে বলা হতো 'কশাই স্যার' কী কারণে জানি না। বলা বাহুল্য এসব নাম কখনও প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা হতো না। যে কারণে স্যাররা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহিত ছিলেন না।

আরও অনেক দুষ্টুমি করতো ক্লাসের ছেলেরা, তবে কোনোটাই তেমন ক্ষতিকর কিছু নয়। ক্ষতির দৌড় ওই মুরগি চুরি পর্যন্ত, তার বেশি নয়, তাও গোটা স্কুল জীবনে একবারই।

শিক্ষকদের প্রিয় মুখ

এগারো বছর পড়েছি সাধু গ্রেগরির স্কুলে। শিক্ষক হিসেবে যাঁদের পেয়েছি তাঁরা প্রায় সবাই মনের ওপর স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছেন। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি তারা কী খুব জ্ঞানী ছিলেন? খুব কী পন্ডিত ছিলেন? কলেজে উঠে অধ্যাপক অজিত গুহকে পেয়েছি শিক্ষক হিসেবে, ভাষা আন্দোলনের সময় জেল খেটেছিলেন, সেই থেকে দেশের শিক্ষিত সমাজ তাঁর নাম জানতো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা শিখেছিলেন, যাঁর প্রশংসাপত্রে বিশ্বকবি লিখেছিলেন, 'আমার অজিত বাংলা জানে।'

কলেজে শিক্ষক ছিলেন শওকত আলীর মতো বরেণ্য কথাশিল্পী। ইংরেজীর আবদুল মতিন, অংকের খোদাদাদ খান কিংবা বাংলায় আরও যাঁরা ছিলেন রাহাত খান, আবুল কাশেম চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শামসুজ্জামান খান, খ্যাতি আর পাণ্ডিত্যে এঁদের জুড়ি মেলা ভার। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়তে গিয়ে পেয়েছিলাম আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, নীলিমা ইব্রাহিম, আনোয়ার পাশার মতো দেশবরেণ্য অধ্যাপকদের। ইংরেজিতে ছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আর রাজিয়া খানের মতো বিখ্যাত লেখকরা। কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তালিকায় আরও অনেক মেধাবী শিক্ষক ছিলেন, যাঁদের নিয়ে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় গর্ব করতে পারে।

কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদের সরাসরি ছাত্র ছিলাম না, পরে যেসব শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে নিজেকে আলোকিত করেছি, তাঁদের ভেতর শওকত ওসমান, আবদুর রাজ্জাক, বদরুদ্দীন উমর, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মুস্তফা নুরউল ইসলাম, ডঃ খান সারওয়ার মুরশীদের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা রয়েছেন। জয়নুল আবেদীন আর শফিউদ্দিন আহমদের মতো খ্যাতিমান শিল্পী শিক্ষকদেরও সংস্পর্শে এসেছি। এদের সকলের কাছেই আমার অনেক ঋণ। তারপরও

বলবো সবচেয়ে বেশি ঋণী আমি যাঁদের কাছে তাঁরা হলেন আমার স্কুলের শিক্ষক।

আমাদের স্কুলে যাঁরাই পড়েছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন— সেকালে সাধু গ্রেগরির শিক্ষকরা জাদু জানতেন। এখনকার কথা জানি না, তখন শুধু লেখাপড়া নয়, এক তাল নরম কাদার মতো ক্ষুদে ক্ষুদে অসহায় মানবসন্তানদের দক্ষ কারিগরের মতো এমনভাবে তাঁরা গড়ে দিতেন— জীবনের বাকি পথ চলতে গিয়ে যাতে মুখ থুবড়ে পড়তে না হয়।

অন্য স্কুলের কথা জানি না, আমাদের স্কুলে যারাই পড়েছে, যতো বয়সই হোক না কেন স্কুল প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলে অবধারিতভাবে সেখানে সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করতেন আমাদের শিক্ষকরা। কবে পড়েছি ব্রাদার হোবার্ট, গাঙ্গুলি স্যার, নলিনী স্যার, নিকোলাস স্যার, শুভদারঞ্জন স্যার আর বিজি চৌধুরী স্যারের ক্লাসে। এখনও স্কুলের কাউকে পেলে জানতে ইচ্ছে করে তাঁরা কেমন আছেন।

ক্লাস টুতে আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন নিখিল স্যার, পিরিয়ড় ছিলো চারটা, সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখতেন। গোলগাল ফর্শা চেহারা, রাগীও কম ছিলেন না, তারপরও বলতে পারি নিখিল স্যারের জন্যেই স্কুল আর ক্লাস ভালো লাগা শুরু করেছিলো তখন থেকে। আমাদের ক্লাসে ছিলো বেদানন্দ পাইন নামের একা ছেলে। বয়সে আমার চেয়ে তিনি চার বছরের বড় হবে, মাথায় এক বিঘতের চেয়ে বেশি লম্বা, একটু সরল টাইপের। কেন জানি না ওর ওপরই নিখিল স্যারের রাগ ছিলো বেশি। গান খুব ভালোবাসতেন নিখিল স্যার। সপ্তায় একটা ক্লাস তিনি আমাদের গান শেখাতেন। 'খর বায়ু বয় বেগে,' 'আমি ভয় করবো না,' 'চল চল চল,' এসব গান ক্লাস টুতে থাকতেই কোরাসে খুব গাইতাম। বেদানন্দকে কান ধরে টেনে নিখিল স্যার গান গাইতেন— 'আমি ভুলে গেছি তব পরিচয়, তবু তোমারে তো আজো ভুলি নাই।' গানের তালে তালে বেদানন্দের মাথাটি দোলাতেন তিনি।

ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছি নিখিল স্যারের কাছে। স্কুল ছাড়ার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই গোলাগাল হাসিভরা চেহারা এখনও চোখের সামনে ভাসে। নিখিল স্যার মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ হয়েছেন। এখন তাঁর ছেলে নীলোৎপল সেই একই স্কুলের শিক্ষক।

ক্লাস থ্রি ফোরে কয়েকজন টিচারকেই ভালো গেলেছিলো। তখন পুরো সাত পিরিয়ড ক্লাস হতো। থ্রিতে গাঙ্গুলী স্যার ছিলেন ক্লাস টিচার। হালকা ছিপছিপে শরীর, টিকি পৈতেওয়ালা খাঁটি ব্রাহ্মণ, রেগে গেলে ক্লাসের এ মাথা থেকে ও মাথা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতেন। ক্লাসে গোলমাল হলে ধমক দিতেন— 'উমবাচ্চু, বাজার পেইচিস, বাজার? সুত্রাপুর আর রায় সাহেবের বাজার?' বলে চারপাশে চোখ বুলিয়ে আরো জোরে ধমকাতেন— 'হাড় গুড়ো করে ফেলবো।'

যেভাবে চোখ পাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে গাঙ্গুলী স্যার ধমকাতেন তাতে হাসি চেপে রাখা খুব কঠিন হতো। ওঁর রাগ ছিলো কলতাবাজারের টুলুর ওপর। কারণ টুলুর বাবা এই স্কুলেই ওঁর ছাত্র ছিলেন। টুলুকে বলতেন, 'হ্যাঁরে শহীদুল, তোর বাবাকে

আমি পড়িয়েছি। তিনি এত ভালো মানুষ ছিলেন আর তুই কিনা তাঁর ছেলে হয়ে . . .' বলেই ওর পিঠের ওপর দুম করে এক কিল। এখনও পষ্ট মনে আছে, কিল খেয়ে কাঁদবে কি, বেচারা টুলু, হাসি চাপতে গিয়ে ওর প্রাণান্তকর অবস্থা।

মাঝে মাঝে ভুল করে গাঙ্গুলি স্যার আমাকেও বলতেন, 'হ্যাঁরে শ্যারিয়র, তোর বাবাকে আমি পড়েয়েছি। তিনি এত ভালোমানুষ ছিলেন . . . ।' বাবা কস্মিনকালেও গাঙ্গুলি স্যারের ছাত্র ছিলেন না।

ক্লাস ফোরে মাত্র এক বছরই পেয়েছিলোম রেমন্ড স্যারকে। সুদর্শন, মৃদুভাষী, কথা বলার সময় মৃদু হাসতেন, আমাকে বলতেন, 'এই যে রবীন্দ্রনাথ . . . ।' বাংলায় ভালো ছিলাম বলে তিনি রবীন্দ্রনাথ ডাকতেন আমাকে। শিবরামের একটা গল্পে পড়েছিলাম, একটা ছেলেকে ক্লাসের টিচার থেকে শুরু করে সবাই বাঁদর ডাকতো বলে একদিন ওর মনে হলো ও বুঝি সত্যি সত্যি বাঁদর হয়ে গেছে। রেমন্ড স্যার হয়তো ভাবতেন রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে শুনে যদি কখনো রবীন্দ্রনাথের মতো হই!

ক্লাসে ফোরে ইদ্রিস স্যারকে প্রথম পেলাম আমরা। পরে ওপরের ক্লাসেও ওঁকে পেয়েছিলাম। ক্লাস টেন–এও আমাদের বাংলা পড়াতেন ইদ্রিস স্যার। কী সুন্দর দেখতে ছিলেন, হাতের লেখা তো অবিকল রবীন্দ্রনাথের মতো! থাকতেন গেন্ডারিয়া, ওঁর বাড়িতেও অনেক গেছি। ওঁর আদি বাড়ি ছিলো পশ্চিমবঙ্গে, বাংলা ইংরেজি দুটোই এত শুদ্ধ উচ্চারণ করতেন— এখনও কানে লেগে আছে। ক্লাস ফোরে পড়াতেন ইংরেজি। সাধারণ রিডিং–ও যে কত ছন্দময় আর মাধুর্যময় হতে পারে ইদ্রিস স্যারের পড়া না শুনলে বলে বোঝানো যাবে না।

ক্লাস ফোর–এ আরেকজন টিচার ছিলেন হীরালাল স্যার। বয়স হয়েছিলো অনেক। ফর্শা, হাসি হাসি মুখ, ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে ক্লাসে আসতেন। আমাদের হাতের লেখা লিখতে দিয়ে টেবিলে পা তুলে পরম শান্তিতে চেয়ারে বসে ঘুমোতেন তিনি। ঘুমোনোর আগে বলতেন, 'ওর মেহেদি, জানালার দিকে খেয়াল রাখিস, হেডমাস্টার আসে কি না।' কখন ওকে বলতেন, 'মেহেদি, কটা পাকা চুল বাছ দিকি।' বাছার কোনো উপায় ছিলো না, কারণ তাঁর মাথার ওপর চুল খুব সামান্যই ছিলো, যে ক'খানা ছিলো তাও সব পাকা। মেহেদিকে খুব স্নেহ করতেন তিনি। ওঁকে আমরা ডাকতাম 'মজার স্যার' বলে। কলেজে উঠে 'কচি ও কাঁচা' পত্রিকায় ওঁকে নিয়ে একটা গল্পও লিখেছিলাম আমি।

ক্লাস ফাইভে উঠে পেয়েছিলাম ভৌমিক স্যারকে। বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন। কি জাদু ছিলো ওঁর পড়াতে জানি না, ব্যাকারণের সূত্রগুলো সেই যে মুখস্ত করিয়ে দিয়েছিলেন এখনও মনে আছে। তবে পড়া না পারলে ওঁর মতো কড়া আর কেউ নন। বলতেন, 'অই শাহারিয়া, খাইছিস আমার মুগুইরা কিল? দিমু দুই চাইড্ডা?' পিঠের ওপর ডাস্টার দিয়ে মারতেন। বেচারা বেদানন্দ! ওই সবচেয়ে বেশি খেয়েছে ভৌমিক স্যারের মার।

ক্লাস ফাইভের রহমতুল্লা স্যারের কোনো তুলনা ছিলো না। পেনমেনশিপ করাতেন

তিনি। ব্ল্যাক বোর্ডে নিজে লিখতেন, ক্লাসে ঝোলানো হস্তাক্ষরের নমুনা বোর্ডের মতো অবিকল আমেরিকান স্টাইলে। আমরা তো বটেই লেখার পর রহমতউল্লাহ স্যার নিজেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতেন নিজের লেখা। নিয়ম ছিলো ক্লাস শেষ হওয়ার পর পরের ক্লাসের টিচার আসার আগেই মনিটর বোর্ড মুছে পরিষ্কার করে রাখবে। রহমতুল্লা স্যার জিজ্ঞেস করতেন 'পরের ক্লাস কার?' বলতাম 'সিরাজুল হক স্যারের।' ঘন্টা বাজার পর ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বোর্ডে নিজের হাতের লেখা দেখিয়ে রহমতুল্লা স্যার বলতেন, 'অখন মুছবা না। স্যারে কইলে তখন মুছবা।' তিনি চাইতেন অন্য টিচারারও তাঁর হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হোক।

আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন জেঠুর কারণে। জেঠু ছিলেন মওলানা, আলীয়া মাদ্রাসার প্রফেসর। রহমতুল্লা স্যার ভালো করে জানতেন ওঁকে। একদিন জেঠুদের মোগলটুলির বাড়িতে আমাকে দেখে পরদিন ক্লাসে ডেকে বললেন, 'তুমি মওলানা হাবীবুল্লা সাবের ভানৃজা, আমারে আগে কও নাই ক্যা?' যেন না বলে মহা অন্যায় করেছি।

রহমতুল্লা স্যার ক্লাসে জ্বীনের গল্প করতেন, দাদাজী কেবলার দুটো পোষা জ্বীন ছিলো, অজগর সাপের সুরত ধরে তারা দাদাজীর দরবারে পড়ে থাকতো— এমন অনেক গল্প ওঁর ভাণ্ডারে জমা ছিলো। ওঁর কথাও আমার এক বইতে আছে।

গল্প বলতেন শুভদারঞ্জন স্যার। পাজি ছেলেরা ওঁকে ডাকতো 'ষ্টেডিয়াম স্যার' বলে, মাথায় ছোট একটা টাক থাকার কারণে। তিনি বলতেন অশরীরী আত্মাদের গল্প। আমাদের চারাপাশে নাকি লক্ষ কোটি অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মুক্তি দেয়ার কেউ নেই বলে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নয়, অত্যন্ত ভক্তিভরে তিনি আত্মাদের কথা বলতেন। আত্মাদের 'আপনি' সম্বোধন করতেন, যেন ওরা স্যারের চারপাশে দাঁড়িয়ে ওঁর কথা শুনছে। বলতেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সব সন্ন্যাসী, তপস্বী, আর কাপালিকদের কথা। 'গন্ধীবাবা, 'মছলিবাবা'— আরও যে কত নাম ছিলো সেই সিদ্ধপুরুষদের এখন মনে নেই। আমার অনেক লেখায় ওঁর কথা আছে।

গল্প বলার কোনো জুড়ি ছিলো না নিকোলাস স্যারের। ছিলেন স্কাউট টিচার, ক্লাস সিক্স-এ আমাদের ভূগোল পড়াতেন। ওঁর ভূগোল পড়ানোর ভঙ্গিটি এমন ছিলো—মনে হতো আমরা নিজেরাই চলে গেছি ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রেইরি অঞ্চলে, কিংবা সাদা বরফে ঢাকা শ্বেত ভল্লুক ঘুরে বেড়ানো তুন্দ্রা অঞ্চলে। আফ্রিকার মানুষ খেকো গাছ, আমাজনের গভীর অরণ্যের নরখাদক সব কিছু ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে বেড়াতো। ওঁর কথা বলতে গেলে বইয়ের পর বই লিখতে হয়।

স্কুল ছাড়ার বহু বছর পর নিকোলাস স্যার একবার এসেছিলেন আমার অফিসে, তাঁর একটা সমস্যা নিয়ে। তখনও 'নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা' লিখিনি। আমি অবাক হয়ে গেলাম যখন নিকোলাস স্যারকে দেখলাম আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করছেন। স্যারকে বার বার বললাম, 'আমাকে 'তুমি' বলতে, স্যার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনি যেখানে বসে আছেন সেটাকে সম্মান দেখানো আমার কর্তব্য।' শুনে

ভীষণ খারাপ লেগেছিলো। এরপরই নিকোলাস স্যারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাবার জন্য লিখেছিলাম 'নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা।'

বি জি চৌধুরী স্যারের ক্লাসও কি কেউ কখনও ভুলতে পারবে? বিজ্ঞান পড়াতেন, যত না বইয়ের, তার চেয়ে বেশি বইয়ের বাইরের। ক্লাস সিক্স-এ যদিও আমাদের বইয়ে ছিলো না, ডারউইনের বিবর্তনবাদ মাথায় এমনভাবে ঠেসে দিয়েছেন যে আর কখনও বেরোতে পারে নি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে বাঁদর ছিলেন এর অকাট্য প্রমাণ দিয়েছিলেন এই বলে—'বাঁদরের যেখানে লেজ থাকে তোমাদের সে জায়গায় হাত দিয়ে দেখলে টের পাবে একটুখানি উঁচু হারে আছে এখনও!' বলার সময় মিট মিট করে হাসতেন তিনি। তাঁর বাবা ঠার্কুদারা জমিদার ছিলেন, তিনি আর তাঁর ছোট ভাই দুজনই শিক্ষকতা করতেন আমাদের স্কুলে, অনেকটা শখ করে।

সেভেনে উঠে আমরা পেয়েছিলাম মৌলভি স্যারকে। নাম মুস্তাফিজুর রহমান, বাড়ি নোয়াখালী, কথা বলতেন বিশুদ্ধ শান্তিনিকেতনী ঢংয়ে। ইংরেজি ভালো জানতেন না। তাঁর ক্লাসে কোনো নোটিস এলে মনিটরকে গম্ভীর গলায় বলতেন—'নোটিসটা পড়ে বলে দাও।' অথচ উর্দু পড়াতেন এমন এক মোহনীয় ভঙ্গীতে, তখনকার পাঠ এখনও আমার মুখস্ত আছে। এখনও কানে ভাসে তাঁর জলদগম্ভীর আবৃত্তি—'জানতা আগার ইস হাসি কি দর্দেনাক আনজাম কো, ম্যায় হাওয়াকে গুদগুদানেসে না হাসতা নাম কো - - - ।'

ব্রাদারদের ভেতর আমরা নাইন-এ উঠে পেয়েছিলাম ব্রাদার হোবার্টকে। ইংরেজি পড়াতেন, নিজে চমৎকার নোট তৈরি করে সাইক্লোস্টাইল করে আমাদের দিতেন। এখন বয়স হয়েছে, চেহারা ভেঙে গেছে, বয়সকালে হলিউডি ছবির নায়কদের মতো ছিলেন, অনেকটা জাঁদরেল অভিনেতা পিটার উস্তিনভের মতো। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মোটা ফ্রেমের চশমা, স্নেহ, ভালোবাসা আর সেই সঙ্গে দুষ্টুমিভরা দুটো চোখ—প্রথম দেখাতেই ওঁকে আমরা সবাই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তখন ওঁর বয়স তিরিশের মতো হবে, মোটা মোটা চুরুট খেতেন, নাকি স্কুলে থাকতেই তামাক ধরেছিলেন। এ নিয়ে তাঁর বাবা যে তাঁকে কি কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন সেই করুণ গল্প এমনভাবে বলতেন আমাদের হাসি চেপে রাখা কষ্টকর হতো। ' আমারে ত একদিন দেইখা ফালাইল। তারপর একটা আস্ত তামাক পাতা আইন্যা আমার বাপে আমারে কয় এইটা চাবাইয়া খা, তর শাস্তি! আমি সেই তামাক পাতা চাবাইতে লাগিলাম, আমার চক্ষু দিয়া পানি বাইর হইল, আমার চেহারা একবার লাল হইল, একবার নীল হইল, একবার বেগুনি হইল। তারপর আমি ফিট হইয়া পইড়া গেলাম।'

ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে ব্রাদার হোবার্ট এমন এক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন-- সবাই ভাবতো তিনি বোধ হয় তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আমাকে ভালোবাসতেন বই পড়ার জন্য। আমাদের স্কুল লাইব্রেরির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। স্কুল ছুটির পর লাইব্রেরির কাউন্টারে গিয়ে বসতেন, আমাদের ক্লাসের শাহরুখ ওঁকে সাহায্য করতো। এক ঘন্টা খোলা থাকতো লাইব্রেরি। ছুটির ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে

লাইব্রেরিতে ছুটে যেতাম। একবারে একটা বাংলা আর একটা ইংরেজি বইয়ের বেশি দেয়া হতো না। প্রথমে একটা ইস্যু করে হেডমাস্টারের জানালার নিচে শান বাঁধানো বেঞ্চের মত—ওখানে বসে আস্ত বই গোগ্রাসে গিলতাম। শেষ করে ওটা ফেরত দিয়ে দুটো বই নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। বই বাছতে অনেক সময় ভুল হলে শুধরে দিতেন ব্রাদার হোবার্ট। একবার রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত বইটা ইস্যু করতে গেলাম। ব্রাদার মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তুমি যা ভাবতাছ এইটা সেই বই না। এইটা কঠিন কঠিন প্রবন্ধের বই।' বাংলা বলা শিখেছেন বান্দুরায় থেকে, গ্রামের মানুষ আর কাজের লোকদের কাছে কিন্তু বাংলা সাহিত্য ভালোই পড়া ছিলো, বাংলা লিখতেনও সুন্দর।

নিচের ক্লাসে আমাদের প্রিয় ছিলেন ব্রাদার ফিলিপ্স আর ব্রাদার পিটার। ব্রাদার ফিলিপ্স ছিলেন শুকনো লম্বা লিকলিকে, আর ব্রাদার পিটার ছিলেন মোটাসোটা মানুষ। দুজনেরই হাসি হাসি চেহারা। ওয়ান টু-তে যখন পড়তাম তখন ক্লাস শুরু হতো সকাল আটটায়। আমাদের অনেকে সাতটায় চলে আসতো স্কুলে। লাইন ধরে দাঁড়াতাম মেইন বিল্ডিং-এর সিড়ির নিচে। কখন ব্রাদার পিটার নামবেন সেই অপেক্ষায়। ব্রাদার পিটার নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই কোরাসে 'গুড মর্নিং' বলতাম। তিনি তখন আমাদের এক একজনকে কোলে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিতেন। অন্য ব্রাদারদের 'গুড মর্নিং' বললে হেসে 'গুড মর্নিং' বলে তাঁরা চলে যেতেন, কেউ ব্রাদার পিটারের মতো আদর করতেন না। আর ব্রাদার ফিলিপ্স কোথেকে প্রোজেক্টর এনে স্কুল ছুটির পর আমাদের সবাইকে হলরুমে নিয়ে মিকি মাউস আর ডোনাল্ড ডাক-এর কার্টুন ছবি দেখাতেন।

ওপরের ক্লাসের টিচাররা যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। বাড়তি গাম্ভীর্য নিয়ে চলাফেরা করতেন। নিচের ক্লাসে পড়ার সময় দূর থেকে তাঁদের দেখে ভয়ই পেতাম। পরে ক্লাস করতে গিয়ে দেখি, যে নলিনী স্যারের ভয়ে সিটিয়ে থাকতাম তিনি নিজেই শুধু হাসতে জানেন না, গম্ভীর মুখে হাসির গল্প বলে সবাইকে হাসাতেও জানেন। গেবরিয়েল স্যারকে মনে হলো মাটির মানুষ। পি ডি কস্টা স্যার সম্পর্কে বড়দের কাছে শুনেছি নাকি ভীষণ রাগী। আমরা নিয়মিত ক্লাসে কখনও তাঁকে পাই নি। তবে অনেক সময় এসেছেন অন্য কারও অনুপস্থিতিতে। এসেই গল্প। শুধু নিজে বলতেন না, আমাদেরওবলতেন—'তোমাদের ক্লাসে কে গল্প বলতে পারে। এদিকে এসো।' ক্লাসের সবাই ঠেলেঠুলে আমাকে পাঠাতো। এঁদের কথা বলে কখনও শেষ করা যাবে না।

মনে আছে ক্লাস টেন-এ ওঠার পর একদিন শুনি সরকার স্যার চাকরি থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তাঁকে ফেয়ারওয়েল দেবেন শিক্ষকরা। সরকার স্যারের নাম ছিলো 'অংকের জাদুগর।' ক্লাস এইটে অংক করাতে এসে আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন দুটো অংকের ফল বলে। একজন ছাত্রকে ডেকে ব্ল্যাক বোর্ডে দশ অংকের একটা সংখ্যা লিখতে বললেন। লেখার পর ওটার নিচে দশ অংকের আরেকটা সংখ্যা লিখতে বললেন। এবার বললেন গুণ করতে। দশ অংকের গুণ মানে কম করে হলে দশ মিনিট লাগবে। ডান দিক থেকে এক এক করে গুণ করতে যাবে— স্যার বাধা দিলেন,

'দাঁড়াও, আগে ফলটা পাশে লিখে নাও।' এই বলে গড় গড় করে অনেকগুলো সংখ্যা বলে গেলেন। সেগুলো লেখার পর স্যার বললেন, 'এবার গুণ করে ফল মিলিয়ে নাও।' যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, লসাগু, গসাগু কিংবা বর্গমূল বের করা—সবই সরকার স্যার এই নিয়মে করতেন।

তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা দেবেন শিক্ষকরা। ব্রাদার হোবার্ট আমাদের ডেকে বললেন, 'শুন শ্যারিয়ার, আমরা সরকার স্যারের যে ফেয়ারওয়েল দিব তুমি সেই পার্টিতে ছাত্রদের পক্ষ হইতে কিছু বলিবা। আমরা ঠিক করিয়াছি ছাত্রদের পক্ষ হইতে শুধু তুমি সেইখানে উপস্থিত থাকিবা।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'লিখে আনবো না এমনি মুখে বলবো?' ব্রাদার বললেন 'লিখিয়া আনিবা, ভাল হইলে স্যাররে ওইটাই আমরা বাঁধাই করিয়া দিব।'

অনেক আবেগ আর কোটেশন দিয়ে ভারি ভারি শব্দ বাছাই করে আমার ভাষণটা দাঁড় করালাম। টিচারদের মধ্যে কে বলেছিলেন মনে নেই। আমি বলার পর দেখলাম সরকার স্যার আর কয়েক জন রুমালে চোখ মুছলেন। অনুষ্ঠানের শেষে ব্রাদার হোবার্টকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন হয়েছে?'

ব্রাদার চোখ টিপে হাসলেন —'তোমার কথা শুনিতে শুনিতে দুঃখে আমার এক চোখ দিয়া পানি বাইর ওইতাছিল।'

'এক চোখ দিয়ে কেন ব্রাদার?' জানতে চাইলাম আমি।

'আরেক চোখ দিয়া হাসিতে হাসিতে তোমারে থ্যাংকস দিতাসিলাম, তুমি বুঝ নাই।' হা হা করে হাসলেন ব্রাদার—'তুমি খুব সোন্দর সোন্দর কোটেশন দিয়াস।'

একটা কোটেশন আমার এখনও মনে আছে, জওহরলাল নেহরুর লেখা থেকে নিয়েছিলাম— Our debt to the teacher have we paid it? আমরা কি শিক্ষকদের কাছে আমাদের ঋণ পরিশোধ করেছি?

আনন্দ আর উৎসবের সমারোহ

এখন হয় কি না জানি না, আমাদের সময় স্কুলে অনেক রকম উৎসব হতো। ডিসেম্বরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর উৎসব ছাড়াও বার্ষিক আনন্দমেলা, বিজ্ঞান মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন—একটার পর একটা লেগেই থাকতো। এর মাঝখানে কখনও স্কুলের ভেতর প্রোজেক্টর বসিয়ে সিনেমা দেখা, কোনো শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা, স্কাউটিঙের সুবাদে ক্যাম্পিঙে যাওয়া, এসবও উপভোগ করতাম।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে শুধু যে ক্লাসের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ডবয়রা পুরস্কার পেতো তা নয়, প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্যও চমৎকার পুরস্কার পাওয়া যেতো। পুরস্কার বিতরণ ছাড়াও সেদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। ছেলেরা, গান গাইতো, যন্ত্রসঙ্গীত বাজাতো, কবিতা আবৃত্তি করতো, নাচতো, কৌতুক অভিনয় দেখাতো—সব মিলিয়ে খুবই জমজমাট হতো সেই অনুষ্ঠান। যারা পুরস্কার পেতো তাদের বাবা মাও আসতেন বিশেষ নেমন্তন্ন পেয়ে। উৎসব আয়োজনের মূল দায়িত্ব ছিলো নিখিল স্যারের ওপর। তিনি ঠিক করতেন কে কি করবে।

ক্লাস টু'তে উঠে এ্যানুয়াল পরীক্ষায় আমি সেকেন্ড প্লেস পেয়েছিলাম। দু নম্বরের জন্য ফার্স্ট হতে পারিনি। তার জন্য অবশ্য এতটুকু দুঃখ ছিলো না। সেবার দুটো পুরস্কার পেয়েছিলাম। একটা ক্লাসে সেকেন্ড হয়েছি বলে আরেকটা পারফেক্ট এ্যাটেনডেন্স-এর। পুরস্কারের অনেক বইয়ের ভেতর একটা বইয়ের নাম আজও মনে আছে। সেটা ছিলো জন স্টেইনবেকের উপন্যাস—ছোটদের মতো করে অনুবাদ 'লাল ঘোড়া।' ক্লাস সিক্স-এ ওঠার পর অনুবাদ নয়, মূল বই পুরস্কার দেয়া হতো। 'রবিনসন ক্রুসো, 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন,' 'রবিন হুড,' 'টম ব্রাউনস স্কুল ডেয,' 'ব্ল্যাক এ্যারো'—এসব বই ইংরেজিতেই পড়েছি। বেশির ভাগ সময় বাবা পড়ে শোনাতেন, না বুঝলে বাংলা অর্থ বলে দিতেন। 'ল্যাম্বস টেলস ফ্রম শেক্সপীয়ার'ও পড়ে অনুবাদ করে

শুনাতেন বাবা।

আমি পুরস্কার পেলে ভাইয়ার চেয়ে বাবলু বেশি খুশি হতো। বাড়ি ফেরার সময় প্রাইজের বইগুলো ও নিজের বুকের কাছে আগলে রাখতো।

বি জি চৌধুরী স্যার শুক্রবার স্কুল ছুটির পর আলাদাভাবে ড্রইং ক্লাস নিতেন। ওটা বাধ্যতামূলক ছিলো না। তবে ক্লাস করতে চাইলে খাতায় নাম লেখাতে হতো। স্যার বছরে দুবার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন ড্রইং ক্লাসের ছেলেদের জন্য। পুরস্কার দিতেন দামী খেলনা নয়তো রঙের বাক্স। ব্রাদাররা সরবরাহ করতেন সেসব। পুরস্কার একটাই ছিলো আর সেটা ছিলো আসেম আনসারীর জন্য বাঁধা। নিচের ক্লাসে থাকতেই আঁকিয়ে হিসেবে আসেম দারুণ নাম করেছিলো। স্কুলে থাকতে প্রেসিডেন্টের গোল্ড মেডেল পেয়েছিলো। পরে তো ওর নাম দেশের বাইরেও ছড়িয়েছে।

আমি নিয়মিত ড্রইং ক্লাস করতাম, আঁকার হাত খারাপ না হলেও আসেমের ধারে কাছে যাওয়ার সাধ্য ছিলো না। ক্লাস এইটে না নাইনে ওঠার পর এক শুক্রবারে ড্রইং ক্লাসের প্রতিযোগিতা হবে। সেদিন আবার আমরা কজন ঠিক করেছি গুলিস্তানে স্পেশাল শো দেখবো। বাবলু এসে বললো, 'ড্রইং পরীক্ষাটা দে না, দারুণ একটা প্রাইজ আছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী প্রাইজ?'

'বড় একটা খেলনা ট্রাক। একেবারে সত্যিকারের ট্রাকের মতো। তুই পরীক্ষা দিলে পাবি।'

'আসেম আছে না ক্লাসে?'

'আছে। তবু আমার মনে হচ্ছে তুই পরীক্ষা দিলেই ট্রাকটা পাবি।'

বাবলুর কথায় ছবি দেখার পরিকল্পনা বাতিল করে ড্রইং ক্লাসে গিয়ে অনেক ছেলের সঙ্গে ছবি আঁকতে বসলাম।

খাতা জমা দেয়ার সময় দেখলাম আমার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর ছবি এঁকেছে আসেম। জানতাম পুরস্কার পাবো না। সিনেমা দেখাটা মাটি হলো বলে রাগ হচ্ছিলো বাবলুর ওপর। কিছুক্ষণ পর আমাকে অবাক করে দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কারটা আমার হাতেই তুলে দিলেন স্যার। আসেমের চেয়ে আমি কিভাবে বেশি নম্বর পেলাম এটা স্যারকে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারিনি। স্যার বললেন, 'আসেম ঠিক মতো ক্লাস করে না। একশ নম্বরের ভেতর বিশ নম্বর ছিলো হাজিরার। অন্য বিষয়ে আসেম আশিতে আশি পেলেও হাজিরার জন্য মাত্র পাঁচ পেয়েছে। তুমি অন্য বিষয়ে সত্তর পেয়েছো, হাজিরায় পেয়েছো বিশে বিশ নম্বর। দুটো যোগ করে তোমার নম্বর বেশি হয়েছে।'

বুঝলাম আসেমকে নিয়মিত ড্রইং ক্লাসে করতে প্রলুব্ধ করার জন্য বি জি চৌধুরী স্যার এরকম কান্ড করেছিলেন। অবশ্য আসেম এসব পুরস্কারের অনেক উর্ধে মনে করতো নিজেকে। এরপরও ওকে ড্রইং ক্লাসে নিয়মিত দেখতাম বলে মনে হয় না।

আমার ছোট ভাই পুরস্কারের গাড়িটা বুকের কাছে চেপে ধরে বাড়ি ফিরলো। ওর

উচ্ছ্বাস দেখে মনে হয়েছিলো আমি নই বুঝি পুরস্কারটা ওই পেয়েছে। মা হারিয়েছে দেড় বছর বয়সে, খালাদের বাড়িতে অনাদরে থেকেছে। ওকে কোনো কিছুতে আনন্দ পেতে দেখলে বুকটা ভরে যেতো।

আমরা যখন নিচের ক্লাসে পড়তাম, তখন দেখেছি প্রতি বছর আনন্দ মেলা হতে। আনন্দমেলায় ছেলেদের হস্তশিল্পের প্রদর্শনী হতো, নাগরদোলা থাকতো, নানারকম গেম থাকতো, ম্যাজিক শো হতো। এক বছর মনে আছে, বড় মাঠের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দড়ি টানিয়ে ওটার সঙ্গে মস্ত বড় একটা প্লেন কপিকলের মতো করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিলো। প্লেনের ফ্রেম ছিলো বাঁশের, ওপরে কাগজ দিয়ে মোড়া। যাত্রী বসার জন্য একটা চেয়ারও ছিলো। প্লেনটাকে প্রথমে টেনে উঁচুতে তোলা হতো। তারপর যাত্রী বসিয়ে ছেড়ে দেয়া হতো। কেবল্ কারের মতো প্লেনটা দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে সাঁ করে নিচে নেমে যেতো। প্লেনে চড়ার জন্য সে কি লম্বা লাইন, সারাদিনে আর ফুরোয় না। যাত্রীদের ভিড়ের জন্য সেবার প্লেনে চড়া হয়নি।

প্রদর্শনী বা কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার ব্যাপারে সব সময় আমার ভেতর এক ধরনের আড়ষ্টতা কাজ করতো। ক্লাস ফোর-এ রেমন্ড স্যার ধরলেন আনন্দমেলার কদিনআগে— 'তুমি কোনো ইভেন্টে নাম দিচ্ছো না কেন?'

'আমি কী করবো?'

'যা খুশি একটা কিছু বানাও।'

'কী বানাবো?'

একটু ভেবে স্যার বললেন, 'উত্তর মেরুর একটা দৃশ্য বানাও।'

'কেমন করে বানাবো?'

বুদ্ধিটা স্যারই দিয়েছিলেন। বাজার থেকে ধবধবে সাদা হাঁসের ডিম কিনে মুখটা ছোট করে ভেঙে ভেতরের তরল জিনিসটা বের করে ফেললাম। ফেললাম মানে নর্দমায় ফেলে দেয়া নয়, রান্নাঘরে দিয়ে এলাম খাওয়ার জন্য। ডিমের খোসাগুলো খুব সাবধানে ধুয়ে ওটার গায়ে এস্কিমোদের ইগলুর মতো করে পেন্সিল দিয়ে বরফের খাঁজের দাগ দিলাম। তারপর সেগুলো তুলোর ওপর উপুড় করে বসিয়ে দিতেই চমৎকার ইগলু হয়ে গেলো। শক্ত দুটো পিচবোর্ডে বল্গা হরিণ এঁকে কাঁচি দিয়ে চারপাশটা কাটলাম। বোর্ডের এপিঠ ওপিঠ রঙ করতেই দুটো চমৎকার হরিণ হয়ে গেলো। তারপর বোর্ড দিয়ে স্লেজগাড়ি বানিয়ে ওতে সুতো দিয়ে বল্গা হরিণ জুড়ে দিলাম। বোর্ড কেটে এস্কিমো বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম স্লেজ এর পেছনে। দেখে সবাই খুব প্রশংসা করেছিলো। এর পরের বার বোর্ড কেটে ঘর বানিয়ে সাদা তুলোর ওপর বসিয়ে দিলাম। দোচালা ঘরের চালেও খানিকটা পাতলা তুলোর আস্তর বিছিয়ে দিলাম। দেখে মনে হচ্ছিলো শীত কালে ইউরোপের কোনো গ্রামের দৃশ্য। ডিমের খোসার ওপর চোখ, নাক, মুখ এঁকে চমৎকার রাজারাণীও বানাতাম।

ক্লাস সেভেনে থাকতে বিজ্ঞান মেলায় পৃথিবীর মস্ত বড় রিলিফ ম্যাপ এঁকেছিলাম। বড় হার্ড বোর্ডের ওপর প্রথমে ম্যাপটা এঁকে নিয়েছি। তারপর পাহাড় পর্বতের জায়গায়

শক্ত করে ময়দা মেখে রিলিফ তৈরি করে শুকোনোর পর এ্যাটলাস দেখে উঁচু নিচু জায়গায় যেরকম রঙ হওয়া দরকার রঙ লাগালাম। ভারি সুন্দর রিলিফ ম্যাপ হয়েছিলো। প্রাইজে একবার শৈল চক্রবর্তীর একটা বই পেয়েছিলাম, নাম 'ছোটদের ক্রাফট।' ওতে দারুণ মজার সব জিনিস বানাবার নিয়ম বলে দেয়া হয়েছিলো। আনন্দ মেলা ছাড়াও বাড়িতে সেসব বানাতাম। আজকালকার ছেলেদের সেসব করতে দেখি না।

জেঠু চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন কায়েতটুলির বাড়িতে উঠে গেলেন তখন আবার আমি একা হয়ে গেলাম। তখন আর একাকিত্ব অনুভব করার সময় ছিলো না। সেই সময় পুরোপুরি স্কুলের নেশায় পেয়ে বসেছিলো। যেতাম ক্লাস শুরুর এক ঘন্টা আগে। আসতাম সন্ধ্যার সময় যতক্ষণ না ব্রাদার হোবার্ট চ্যাঁচাতেন— 'অই তারাতরি বারিত যা, বারিত যা! ছয়টা বাজিয়্যা গেছে, বারিত যা। তরাতরি কর!' কোনো ফাংশান না থাকলে সন্ধ্যার পর স্কুলে থাকা বারণ ছিলো।

এইটে কিংবা নাইনে পড়ার সময় ঢাকায় সারকারামা এসেছিলো। স্কুল থেকে আমাদের সবাইকে নেয়া হয়েছিলো আমেরিকান সারকারামা দেখার জন্য। এস্কিমোদের ইগলুর মতো বিশাল একটা অর্ধডিম্বাকৃতি ঘর বানানো হয়েছিলো আউটার স্টেডিয়ামে। ভেতরে কয়েক শ মানুষ দাঁড়াতে পারতো। বৃত্তাকার দেয়াল জুড়ে ছিলো সিনেমার পর্দা। গোটা পর্দায় সিনেমার দৃশ্য ফুটে উঠতো। মনে হতো যেখানকার দৃশ্য ঠিক সেখানে বুঝি খোলা প্লেনে উড়ে বেড়াচ্ছি। সামনে, পেছনে, ডানে, বাঁয়ে সবখানে সিনেমার মতো ছবি।

দৌড়-ঝাঁপ কিংবা ফুটবল-ক্রিকেট জাতীয় খেলাধুলার ব্যাপারে আমার কখনও আগ্রহ ছিলো না। বিকেলে রকিবুল, আশরাফুলরা যখন মাঠে ফুটবল ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতো আমি তখন লাইব্রেরি থেকে একটা বই ইস্যু করে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম। অবশ্য সিক্স-এ ওঠার পর যখন স্কাউটিঙে নাম লেখালাম তখন প্রায় বিকেলে আমাদের শরীরচর্চা আর নানারকম ক্লাশ করতে হতো। স্কাউটিঙ করা যে কী মজার ছিলো সেসব নিয়ে আলাদা একটা উপন্যাসই লিখেছি 'নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা' নামে।

নিজে না খেললেও রকিবুলরা যখন কোনো ইন্টারস্কুল টুর্নামেন্টে খেলতে যেতো অনেক সময় ওদের উৎসাহ দেয়ার জন্য আমরাও দল বেঁধে যেতাম। আমাদের ক্লাসে ফারুখ, শাহাদত, ভূইয়া, আমীন—এরা সবাই খেলাধুলোর ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলো। ফারুখ স্কুল টিমে ক্রিকেট খেলতো। বাস্কেট বলে ফি বছর আমাদের স্কুল চ্যাম্পিয়ন হতো। খবরের কাগজে দেখি এখনও হয়।

স্কুল থেকে কয়েকবার রেডিওতেও অনুষ্ঠান করেছি। সেসব অনুষ্ঠানে স্কাউটরাই বেশি সুযোগ পেতো।

সে সময় আরেকটা কাজে আমরা খুব মজা পেতাম। সেটা হচ্ছে রেডক্রসের জন্য চাঁদা তোলা। সাদা কাগজে লাল ক্রস আঁকা ব্যাজ পরিয়ে দিয়ে পথচারীদের সামনে

ফুটো করা টিন ধরতাম। দু আনা চার আনা করে অনেকেই দিতো, অনেকে আবার বিরক্তও হতো। টিন ভরে গেলে ওটা জমা দিয়ে নতুন টিন নিতে হতো। পাজী ছেলেরা টিন থেকে পয়সা বের করার জন্য অদ্ভুত সব ফন্দি ফিকির বের করতো। ওতে আমাদের কোনো আগ্রহ ছিলো না। আগ্রহী ছিলাম— টিকেট বিক্রির পর যে গিফট বক্স পাওয়া যেতো ওটার ব্যাপারে।

গিফট বক্সগুলো পাঠাতো আমেরিকা থেকে, ওখানকার স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। খাতা, পেন্সিল, রঙ থেকে শুরু করে, ছোট ছোট নানা ধরনের খেলনা থাকতো সে সব বাক্সে। একবার আমাদের স্কুলের সঙ্গে সেন্ট ফ্রান্সিস-এর গিফট বক্স বদল হয়ে গিয়েছিলো। বাক্স খুলে দেখি খাতা, পেন্সিল, রবার, শার্পনার, রঙ—এসব ছাড়াও রয়েছে চুলের কাঁটা, রকমারি ফিতে, কানের দুল, গলার মালা এসব। এ নিয়ে কী হাসাহাসিই না হয়েছিলো।

ক্লাস এইটে ওঠার পর থেকে ব্রাদার হোবার্ট আমাদের চরিত্র রক্ষার ওপরও নজর রাখতেন। একদিন যেমন ক্লাসে ঢুকে বললেন, 'আনসারী উইঠা দাঁড়া। কইল বিকালে তরে আমি বাংলাবাজার মাইয়াগো স্কুলের সামনে ক্যান দেখছি ক।'

আনসারী মুখ কাচুমাচু করে বললো, 'না ব্রাদার, রয়েল স্টেশনারিতে খাতা কিনতে গিয়েছিলাম।'

'আমি সব ট্যার পাই। খবরদার! খবরদার কইতাসি, মাইয়াগো স্কুলের সামনে তগরে য্যান না দেখি!'

ক্লাসের শেষে আনসারীর সে কি রাগ— 'আমরা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারবো না আর নিজেরা তো খুব সিস্টারদের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করেন!'

আজকাল অনেক স্কুলেই ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে পড়ে। ছেলেমেয়েদের মেলামেশাও অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমাদের সময় কোনো স্কুলে সহশিক্ষা ছিলো না। সেন্ট ফ্রান্সিসে শুধু ক্লাস থ্রি পর্যন্ত ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়তো।

আনন্দমেলায় নাটক করার সময় বেশির ভাগ সময় 'নারীচরিত্র বর্জিত' নাটক করতে হতো। তখন বাংলাবাজারে প্রচুর 'নারীচরিত্র বর্জিত' নাটক কিনতে পাওয়া যেতো। একবার আনন্দমেলায় আমাদের এক ক্লাস ওপরের ছেলেরা 'মাঙ্কিস প' গল্পটার নাট্যরূপে অভিনয় করেছিলো। দারুণ ভয়ের গল্প ছিলো ওটা, অভিশপ্ত এক বানরের কাটা পা নিয়ে। ওতে আহরার অভিনয় করেছিলো মহিলার চরিত্রে। আবহ ঠিক রাখার জন্য ও লম্বা ঝুলওয়ালা অনেক লেস টেস লাগানো গাউন পরেছিলো। গল্পটা আগেই পড়া ছিলো। রুদ্ধশ্বাসে আমরা ক্ষুদে দর্শকরা অপেক্ষা করছি বানরের অভিশপ্ত পা দেখার জন্য জন্য। দেখি বানরের পা জোগাড় করতে না পেরে আহরার একটা মুরগির পা হাতে নিয়ে দারুণ সিরিয়াস সংলাপ বলছে। ভয় পাবো কি, বানরের বদলে মুরগির পা দেখে হাসি চেপে রাখাই কঠিন পড়ে পড়েছিলো।

স্কুলের পাশাপাশি বাড়ির উৎসবও কি কম মজার ছিলো! দুই ঈদ, শবেবরাত ছাড়াও মহর্‌রমের মেলা দেখতে যাওয়া, চৈত্র সংক্রান্তির ঘুড়ি ওড়ানো, পয়লা বৈশাখে

হালখাতা খোলার নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার ভেতর কম মজা ছিলো না।

রূপচাঁদ লেনের বাড়ির কথা মনে আছে, ভাইয়া দারুণ ঘটা করে ঘুড়ি ওড়াবার সুতোয় মাঞ্জা দিতো। মস্ত বড় লাটাই কিনে হাজার গজি সুতোর বাণ্ডিল এনে মাঞ্জা দিতে বসতো দলবল নিয়ে। শিরিষের জ্বাল দেয়া পাতলা আঠায় সুতো ভিজিয়ে, মিহি রঙ মেশানো কাচের গুঁড়ো ভেজা সুতোয় লাগিয়ে সেটা শুকিয়ে দারুণ শক্ত মাঞ্জা দেয়া সুতো তৈরি হতো। মাঞ্জার আবার নাম ছিলো-— 'রাগকামানি,' টিলকামানি'—এই সব। টিলকামানি মাঞ্জার সুতো দিয়ে প্রতিপক্ষের ঘুড়ি কাটতে হলে প্যাঁচ লাগার পর শুধু টিল দেয়া হতো। টিল দিতে দিতে এক সময় প্রতিপক্ষের ঘুড়ি কেটে যেতো, আর সবাই চেঁচিয়ে উঠতো—'ভোকাট্টা' বলে। রাগকামানি মাঞ্জায় প্যাচ লাগিয়েই জোরে টান দিতে হতো। ঘুড়িও ছিলো কত বিচিত্র নাম আর রঙের। লম্বা লেজওয়ালা সাপঘুড়ি ছিলো, আকাশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা লেজ নাচিয়ে উড়তো। কাটা ঘুড়ি ধরার উত্তেজনাও কম ছিলো না।

বর্ষার মেঘ কেটে গেলেই আকাশে ঘুড়ি ওড়ানো শুরু হতো। পৌষ মাসের শেষ দিন ছিলো সংক্রান্তি। পুরোনো ঢাকার আকাশে সেদিন হাজার হাজার ঘুড়ি উড়তো। প্রতিযোগিতা চলতো কে কত কাটতে পারে! আগে থেকে প্রচার করা হতো অমুক বাড়ির ঘুড়িতে পাঁচ টাকার নোট, দশ টাকার নোট আটকানো থাকবে। একশ টাকার নোট লাগানো ঘুড়ি ওড়াতেও দেখেছি। সেরকম একটা ঘুড়ি যদি কাটা পড়তো রাস্তার ছেলেরা দল বেঁধে ছুটতো ধরার জন্য। বাড়ির ছাদে সবাই লম্বা লম্বা বাঁশের 'লগ্‌গি' হাতে তৈরি থাকতো ঘুড়ি ধরার জন্য। লম্বা সুতোওয়ালা একটা কাটা ঘুড়ি ধরতে পারলে উত্তেজনায় রাতে ঘুম হতো না। কখনও দেখা গেলো ছাদের ওপর দিয়ে সর সর করে সুতো চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে খপ করে চেপে ধরতাম। দেখা গেলো বহু দূরে কোনো বাড়ির ঘুড়ি অনেক উঁচুতে কাটা পড়েছে। দ্রুত হাতে সেই ছেলেটা লাটাইয়ে কাটা সুতো প্যাঁচাচ্ছে। তখন ধরা মানে বাকি সুতো যে ধরতো তার। এভাবেও অনেক সুতো জোগাড় হতো। আমরা ছোটরা যারা মাঞ্জা দিতে পারতাম না, এভাবে ধরা সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়াতাম।

একবার মনে আছে রূপচাঁদ লেনের বাড়ির ছাদে বসে আছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখি পাশ দিয়ে সুতো যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ধরে টান দেয়া শুরু করলাম। টানি আর সুতো জমা হয়, ঘুড়ির কোনো দেখা নেই। অনেকক্ষণ পর নজরে পড়লো ছোট্ট একটা ঘুড়ি। টেনে নামিয়ে দেখি বিশাল এক বোম্বাই ঘুড়ি। কোত্থেকে কেটে এসেছিলো কে জানে, পুরো এক লাটাই সুতো পেয়েছিলাম, এটা পষ্ট মনে আছে।

মাত্র ক্লাস ওয়ানে পড়ি। তখন থেকেই ঘুড়ি ওড়াতে মজা লাগতো। ক্লাসের ছেলেরাও কে কেমন মাঞ্জা দিতো এ নিয়ে গল্প করতো। দিলীপদের ফরাশগঞ্জের বাড়ির বিশাল ছাদে একবার ঘটা করে মাঞ্জা দেয়া হয়েছিলো। এসব কাজে দক্ষ ভূইয়া শাহাদতদের সঙ্গে আমরা ছোটরাও গিয়েছিলাম। দিলীপ আমাদের সঙ্গে পড়লেও দুএক বছরের বড়ই ছিলো। জমিদারের ছেলে, টাকার অভাব নেই, ঘুড়িই বোধহয় কিনেছিলো

শ' খানেক। মস্তো বড়ো লাটাইয়ের কোনোটায় লাল রঙের রাগকামানি মাঞ্জা, কোনটায় সবুজ রঙের ঢিলকামানি মাঞ্জা—সে এক এলাহী কান্ড। দিলীপদের বাড়িতে গেলে খাওয়া দাওয়াও খুব হতো। পুতুলের মতো সুন্দর দেখতে ওর ছোট বোনের নাম ছিলো শুক্লা, সবার সঙ্গে হেসে গল্প করতো।

কুমারটুলির বাড়িতে আসার আগে কোনো ঈদের কথা মনে নেই। রোজার মাসে মনে আছে জেঠিমা খুব ঘটা করে ইফতারি বানাতেন। জেঠু সদরঘাট থেকে তরমুজ, ফুটি, ক্ষিরা আনতেন। কয়েক রোজা না যেতেই বাড়ির মেয়েরা সেমাইয়ের কল নিয়ে বসতো ঈদের সেমাই বানাবার জন্য। সরু, মোটা, মাঝারি, নানা রকমের সেমাই বানিয়ে রোদে শুকিয়ে কাচ বসানো বড় টিনে তুলে রাখা হতো। সবার জন্য কাপড় কেনা হতো। পাড়ার দরজি এসে ছেলেদের মাপ নিয়ে যেতো। মেয়েদের সালোয়ার কামিজ বাড়িতেই বানানো হতো। জেঠু থান হিসেবে কাপড় কিনতেন, যার জন্য সবার জামা হতো এক রকমের। বাবা পটুয়াটুলির দোকান থেকে রেডিমেড পোষাক কিনতেন।

তখন সব রকমের কাপড় কেনার সবচেয়ে বড় শপিং সেন্টার ছিলো পটুয়াটুলি। নিউমার্কেট তখন মাত্র শুরু হয়েছে, তেমন জমেনি। পুরানা পল্টন, গেন্ডারিয়া এসব জায়গা থেকে বড়লোকের বউরা বড় বড় শেভ্রলেট গাড়ি নিয়ে পটুয়াটুলির ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়, অমৃতবাজার বস্ত্রালয়, সিল্ক প্যারাডাইস আর ফেব্রিক হাউসে আসতো শাড়ি কেনার জন্য। বড়দি, মেজদিদের সঙ্গে আমিও যেতাম কখনও। তখন খবর পাঠালে বড় দোকানের কর্মচারীরা শাড়ির বান্ডিল নিয়ে বাড়ি চলে আসতো।

কোরবানি ঈদে মনে আছে, জেঠুর সঙ্গে বংশাল গরুর হাট থেকে একটা নধর ষাঁড় কিনে এনেছিলাম ষাট টাকায়। পরের বছর ওই সাইজের ষাঁড়ের দাম হয়ে গেলো আশি টাকা। আটান্ন সালের কথা। জিনিসপত্রের দাম কী হারে বাড়ছে এটা একটা আলোচনার বিষয় ছিলো। একটা বড় মুরগি এক টাকায় পাওয়া যেতো। বাবা তখন বেতন পেতেন চারশ কি সাড়ে চারশর মতো।

মহররমে আশুরার দিন মস্ত বড় মিছিল বেরুতো নবাববাড়ি আর হোসেনি দালান থেকে। রঙচঙে জরি মোড়ানো সারা গায়ে তীর বেঁধা কাপড়ে বানানো দুলদুল ঘোড়া আর তাজিয়া থাকতো মিছিলের সামনে। কালো পোষাক পরে সবাই আলতোভাবে বুক চাপড়াতো 'হায় হাসান, হায় হোসেন' বলে। ট্রাকে বড় বড় ড্রাম ভর্তি শরবত থাকতো। ছোটরা দল বেঁধে মিছিলে যেতাম হাসান হোসেনের জন্য শোক করার জন্য নয়, বার বার গ্লাস ভর্তি রঙিন শরবত খাওয়ার জন্য।

শবেবরাতে তখন কেউ কেউ বাজি পোড়াতো, তবে সেগুলো পটকা বা বোমা নয়। মিটফোর্ডের বাজির দোকানে নানারকমের ফুলঝুরি বাজি, তারাবাজি আর হাউই বাজি পাওয়া যেতো। আমরা ছোটরা ঝুল বারান্দায় সারি সারি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে শবেবরাতের আনন্দ করতাম।

নিচের ক্লাসে থাকতে খৃষ্টান সহপাঠীদের সঙ্গে ক্রিসমাসের বড়দিনে যদি কখনও

স্কুলে গিয়েছি ফ্র্যাঙ্কি এসে হাতে রঙিন বেলুন, রঙিন কাচের বল ধরিয়ে দিতো। অগলী সাহেব বড়দিনের কেক পাঠাতেন। কখনও আমরা খেতে যেতাম তাঁর বাড়িতে। আমার বয়সী ওঁর একটা ছেলে ছিলো, রনি নাম। আমাদের স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তো। অনেকগুলো কুকুর ছিলো ওদের। ওদের নিয়ে 'মিকি অগলীর মা' নামে একটা গল্পও লিখেছি।

আমাদের বাড়িটা বুড়িগঙ্গার কাছে ছিলো বলে হিন্দুদের পূজোর সব প্রতিমা বিসর্জন দেখতে যেতাম। দূর্গা পূজোয় দিলীপদের বাড়িতে ঘটা করে পূজো হতো। বিজন, রতনদের নিয়ে ওদের বাড়িতে যেতাম পূজো দেখার জন্য।

বৈশাখ মাসের এক তারিখে বাবার সঙ্গে ঘুরতে যেতাম পটুয়াটুলি আর ইসলামপুরের পরিচিত দোকানে। অনেকে হালখাতা খোলা উপলক্ষে আলাদা নিমন্ত্রণ পত্রও ছাপতো। দোকানের কর্মচারীরা বাড়িতে এসে সেই নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে যেতো। শাড়ির দোকান, তৈরি পোশাকের দোকান, জুয়েলারী শপ, মহেশ ভট্টাচার্যের ওষুধের দোকান, আরও সব মনোহারী দোকান— কত আর মিষ্টি খাবো। না খেলেও দোকানীরা চাইতো নিয়মিত খদ্দেররা হালখাতা খোলার দিন একবার অন্তত তাদের দোকানে আসুক, পুরোনো বছরের বকেয়া যদি কিছু থাকে মিটিয়ে দিয়ে যাক। বাবার অবশ্য কখনওই বাকিতে জিনিস কেনার অভ্যাস ছিলো না। আমাদেরও বাকিতে কিনতে বারণ করতেন।

একজন লেখকের জন্ম

'শাহীন' আর 'সেতারা' নামে তখন ছোটদের দুটো পত্রিকা ছিলো। যখন রূপচাঁদ লেনের বাড়িতে থাকতাম বাবা এ দুটো পত্রিকা ভাইয়ার জন্য কিনতেন, বায়না ধরলে আমাকেও পড়ে শোনাতেন। যখন পড়ার বয়স হয়নি তখনকার শোনা ছড়া এখনও মনে আছে—'ঝি ঝি সই/ তোর পুত কই/ হাটে গেছে/ হাট কই ।' আরও ছিলো—'বুড়ি লো বুড়ি/ কী লো/ তোর হাড়িপাতিলগুলো সরা লো/ কেন লো/ তাল গাছ পড়লো/ ধুপ-পুস।' কার লেখা ছড়া জানি না, ছবি ছিলো পাশে, একটা লোক ঝাঁকা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে এক বুড়ি বসা। রাতে হারিকেনের আলোয় আমাদের বড় বিছানায় বসে বাবা তাল মিলিয়ে ছড়া পড়ছেন, দেড় বছরের ছোট ভাইটা পাশে ঘুমোচ্ছে, আমি আর ভাইয়া পাশাপাশি বসে শুনছি, দেয়ালে আমাদের মস্ত কালো ছায়া ঘরটাকে অন্ধকার করে রেখেছে—এ দৃশ্য আমার আজও মনে পড়ে। 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকেও গল্প পড়ে শোনাতেন বাবা। আমাদের ভালো লাগার জন্য ছড়াগুলো একটু টেনে টেনে সুর করে পড়তেন—'বুদ্ধু আমার বাপ/ কী করেছি পাপ/ কোন পাপে ছেড়ে গেলি/ দিয়ে মনস্তাপ।' এখনও সেই সুর কানে লেগে আছে।

ক্লাস ওয়ানে ওঠার পর বানান করে 'শাহীন', 'সেতারা' পড়তাম। কলকাতার 'শুকতারা'ও আনতেন বাবা। দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রতি বছর যে ঝলমলে পুজোবার্ষিকী বেরুতো সেগুলোও কিনতেন। আমাদের একটা হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানির গ্রামোফোন ছিলো। অনেকগুলো রেকর্ড-এ সিরাজউদদৌলা নাটক ছিলো, নানারকম কমিকও ছিলো। প্রতি মাসে বাবা নতুন রেকর্ড কিনতেন। মা বাবা দু'জনই গান পছন্দ করতেন। মা পছন্দ করতেন রবীন্দ্র সঙ্গীত আর বাবা আধুনিক বাংলা আর হিন্দি সিনেমার গান। রূপচাঁদ লেনের বাড়িতে দুপুর বেলা যখন সব কিছু নিঃসাড় হয়ে ঝিম মেরে পড়ে থাকতো, মা গ্রামোফোনে বাজাতেন 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে

যাবি কে আমারে,' 'আমার সকল দুখের প্রদীপ,' 'রোদনভরা এ বসন্ত,' 'ওই মালতিলতা দোলে,' ''বসন্তে ফুল গাঁথলো'—এই সব গান। বাবা শুনতেন সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, শচীন দেব বর্মণ, রবীন মজুমদার, জগন্ময় মিত্র আর কানন দেবীর গান। রেডিওতে খেয়াল, ঠুঙরি, গজল শুনতে পছন্দ করতেন বাবা। আমাদের একটা বড় মারফি রেডিও ছিলো।

ক্লাস টু-এ ওঠার পর একদিন নিজেই গ্রামোফোন চালিয়ে গান শুনতে গেলাম। কয়বার চাবি ঘোরাতে হতো জানতাম না বলে ঘোরাতে ঘোরাতে স্প্রিং ছিঁড়ে ফেললাম। ঘটাং করে ভেতরে স্প্রিং ছেঁড়ার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ওটা যেভাবে ছিলো সেভাবে রেখে দিলাম। ভাগ্যিস ভাইয়ার গান-টান শোনার সখ ছিলো না তাই ওর চোখে পড়লো না। বাবা যখন অফিস থেকে ঘরে ফিরলেন তখন তাঁকে ভয়ে ভয়ে ঘটনাটা জানালাম। বাবা শুনে একটুও বকলেন না। শুধু বললেন, 'আর কখনও গ্রামোফোন ধরবে না।' পরদিন সকালে ভাইয়াকে বললেন, 'গ্রামোফোনের স্প্রিং ছিঁড়ে গেছে, সারিয়ে আনিস তো।' কথাটা বাবা এমন ভাবে বললেন যেন স্প্রিংটা তিনিই ছিঁড়েছেন।

এসব কাজে ভাইয়ার উৎসাহের অন্ত ছিলো না। সারাতে যদি পাঁচ টাকা লাগে বাড়িতে বলতো ছ টাকা। আমাকে সঙ্গে নিয়ে রিকশায় চেপে লায়ন সিনেমার কাছে গেলো। সেখানে একটা দোকান ছিলো যারা গ্রামোফোনের স্প্রিং সারাতো। সারাতে কত লেগেছিলো মনে নেই, তবে সেদিন বিকেলে ভাইয়া লায়ন সিনেমায় যে ছবি দেখিয়েছিলো— এটা মনে আছে। ছবিটার নাম ছিলো 'আজাদ।' একটা দৃশ্য মনে দাগ কেটেছিলো—নায়িকা বাগানে ঘুরতে ঘুরতে হাতের আপেল ওপরে ছুঁড়ে লুফে নিচ্ছে। নায়ক যে আগে থেকে একটা গাছে চেপে বসে আছে সে খবর নায়িকা জানে না। সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আপেলটা ওপরে ছুঁড়তেই নায়ক খপ করে ওটা ধরে ফেললো। নায়িকা যথারীতি হাত বাড়িয়েছে, আপেল আর ওর হাতে পড়ে না। নায়িকা হতভম্ব হয়ে এদিন ওদিন তাকাচ্ছে। দৃশ্যটা খুবই মজার ছিলো।

কুমারটুলিতে থাকতে ছোড়দি, মেজদিরা যদি কখনও আমার বদলে খাইরি বুয়াকে নিয়ে ছবি দেখতে যেতো ফেরার পর ওদের ধরতাম ছবির গল্প বলতে হবে। হিন্দি ছবির গল্প শুনতেও দারুণ ভালো লাগতো।

অনেক সন্ধ্যায় বড়দির ঘরে দুলাভাই আসর জমিয়ে গল্প পড়ে শোনাতেন। প্রায় ডজন খানেক স্কুল পড়ুয়া শ্রোতার আসরে দুলাভাই মজা পেতেন ভূতের গল্প পড়ে শোনাতে। দুলাভাইর চেহারা আর গলা দুটোই ছিলো সুন্দর। ডাক্তার হলে কী হবে, সাহিত্য পত্রিকা বের করতেন, রেডিওতে নিয়মিত অনুষ্ঠান করতেন, নিজে গল্প লিখতেন—এখনও তাঁর বন্ধুরা বলেন কবিরের লেখার হাত ভারি মিষ্টি ছিলো।

এক সন্ধ্যায় হেমেন্দ্রকুমারের 'মানুষ পিশাচ' পড়লেন দুলাভাই। এক পিশাচ নবাব মৃতের জগতের অতৃপ্ত আত্মাদের ডাকছে এভাবে—'ওরে তোরা আয়, জীবনহারা জীবন্তের দল! দিনের আলো নিভে গেছে, বাদুড়ের ঘুম ভেঙেছে, কালো বেড়াল

জেগেছে, ওরে আয় ।' এমনভাবে পিশাচের গলা নকল করে দুলাভাই সংলাপ উচ্চারণ করলেন ভয়ে আমাদের সবার বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হচ্ছিলো। তারপর ছিলো জীবনহারা জীবন্ত আত্মাদের আগমনের বর্ণনা। শুরু হলো শ্রোতাদের ভেতর ক্যাঁও ম্যাও—'না, আর পড়তে পারবেন না।' ছোটদের ভয়ের বহর দেখে বড়দি দুলাভাইকে বকলেন, 'বাচ্চাগুলোকে এভাবে ভয় দেখাও কেন? অন্য গল্প পড়তে পারো না?'

দুলাভাই তাঁর ভূবন ভোলানো হাসির সঙ্গে বললেন, 'ভয় দেখাচ্ছি না, ভয় ভাঙাচ্ছি।'

আমাদের সাহস বাড়াবার জন্য দুলাভাই ভয়ের গল্প ছাড়াও নানারকম দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শোনাতেন। আমার গল্প শোনার কান এভাবেই তৈরি হয়েছিলো।

ক্লাস–এ ওঠার পর ক্লাসের ছেলেরা আবিষ্কার করলো আমিও জমিয়ে গল্প বলতে পারি। ঠিক ছেলেরা নই, প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন হীরালাল স্যার। বাংলা র‍্যাপিড রিডারের ক্লাস নিতেন। একদিন ক্লাসে এসে বললেন, 'আজ শরীরটা ভালো লাগছে না। তোদের কেউ বরং একটা গল্প শোনা।'

ছেলেরা সবাই হই হই করে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলো। বললো, 'স্যার, এ সব সময় গল্পের বই পড়ে। অনেক গল্প জানে।'

স্যার স্নেহভরা গলায় আমাকে কাছে ডেকে বললেন, 'কী রকম গল্প পড়িস, একটা শোনা তো?'

কদিন আগে 'প্রলয়ের পরে' বইটা পড়েছিলাম। সম্ভবত হেমেন্দ্রকুমারের লেখা। স্মরণশক্তি আমার তখন খারাপ ছিলো না। একবার পড়লেই মনে গেঁথে যেতো। একশ সোয়াশ পৃষ্ঠার বইটা গড় গড় করে বলে গেলাম। গল্পটা দারুণ রোমাঞ্চকর ছিলো। ছেলেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলো। অন্যদিন হীরালালের ক্লাস মানেই কোলাহলের ক্লাস, গাঙ্গুলী স্যার যেমন বলতেন—'সূত্রাপুর আর রায় সাহেবের বাজার।' সেদিন তাঁর ক্লাসে কোনো গন্ডগোল হলো না। স্যার নিজেও ভারি খুশি। এরপর থেকে সপ্তায় একদিন হীরালাল স্যারের ক্লাসে আমার গল্প বলা রুটিনে পরিণত হয়েছিলো।

ক্লাস ফাইভ সিক্স–এ ওঠার পর অন্য স্যাররাও বলতেন। হয়তো কোনো কারণে ইতিহাস বা ভূগোলের স্যার এলেন না, বদলে এলেন অন্য কোনো স্যার। কোত্থেকে পড়ানো হবে, কী হোমওয়ার্ক—কিছুই তাঁর জানার কথা নয়। তাঁকে আসতে হয়েছে—যাতে ছাত্ররা হৈ হল্লা করতে না পারে। তিনি এসে হয়তো বললেন, 'সবাই চুপচাপ বসে থাকো। ইচ্ছে হলে গল্পের বই পড়ো নয় ছবি আঁকো। কোনো গন্ডগোল করবে না। ছেলেরা তখন আমাকে দেখিয়ে বলতো, 'স্যার ওকে বলুন গল্প শোনাতে। ও ভালো গল্প বলতে পারে।'

স্যারও ছেলেদের আবদার উপেক্ষা করতেন না। আমাকে কাছে ডাকতেন। তাঁর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বলে যেতাম আমার ভালো লাগা কোনো গল্প। একবার

নীহাররঞ্জনের 'অস্তি ভগীরথী তীরে' বলেছিলাম সিক্স-এর এক ক্লাসে। তখন বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র শেষ করে নীহাররঞ্জন ধরেছিলাম। কোন স্যার এসেছিলেন মনে নেই। গল্প শেষ হওয়ার পর ক্লাসের শেষে বাইরে ডেকে নিচু গলায় বলেছিলেন, 'এসব গল্প ক্লাসে বলবে না।'

রবীন্দ্রনাথের গল্প তখন মাত্র একটা দুটো পড়েছি। একদিন গল্পগুচ্ছের ভেতর 'গুপ্তধন' গল্পটা পড়ে দারুণ ভালো লেগে গেলো রবীন্দ্রনাথ। 'কঙ্কাল,' 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'গুপ্তধন,'— এসব গল্প প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। ছেলেরা এসব গল্প শুনতে বেশি ভালোবাসতো। আমাদের ক্লাসের আতাউল্লা আমাকে ডাকতো 'গল্পদাদু' বলে।

গল্পের বই প্রচুর পড়লেও নিজে কখনও গল্প লিখবো এমন কথা ক্লাস টেন-এ ওঠার আগে পর্যন্ত ভাবিনি। বাংলা ভালো লিখতে পারতাম, তবে আমার চেয়েও বাংলায় ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্র ক্লাসে ছিলো। ইদ্রিস স্যার আমার বাক্য রচনা বা সাধারণ রচনা লেখা পছন্দ করতেন বইয়ের মতো লিখতাম না বলে। স্কুলে যারা বাংলা পড়াতেন তাঁরা সবাই ভারি অলংকারযুক্ত বাক্য পছন্দ করতেন। আমিও তখন খুব গুরুগম্ভীর বাক্য লিখতাম।

প্রতি বছর আমাদের স্কুলের বার্ষিকী বেরুতো, বাংলা ইংরেজি দুটো বিভাগ। ক্লাস থ্রি থেকে টেন পর্যন্ত ছাত্ররা লিখতো। সম্পাদনা করতেন শিক্ষকরা, বড়লোকদের ছেলেরা বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিতো।

ক্লাস সিক্সে থাকতে আমাদের ইউনুসের লেখা প্রথম বেরিয়েছিলো স্কুল ম্যাগাজিনে। ওরকম বয়সে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে পাওয়াটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার! ইউনুসের লেখা ছাপা হতে দেখে বুকের ভেতর খানিকটা ঈর্ষা যে জন্মায়নি তাতো নয়! বাইরে সেটা প্রকাশ করলাম না। ছাপার হরফে নিজের লেখা দেখে ইউনুস আর ওর বন্ধুদের সে কি উত্তেজনা! আমার ভাবখানা ছিলো, কী এমন আহামরি লেখা! হইচই করার মতো কিছুই নয়। যদ্দুর মনে পড়ে পোষা বেড়ালটার কি যেন দুঃখ নিয়ে লেখা ছিলো গল্পটা। স্কুল ম্যাগাজিনের গল্প যেমন হয় তেমনই।

আমার তাচ্ছিল্য দেখে ইউনুস বলেছিলো, 'ভারি গুমর হয়েছে, লেখা দিয়ে দেখ না ছাপে কিনা।'

আমি বললাম, 'লেখা না চাইলে গায়ে পড়ে কেন দিতে যাবো?'

কে যেন বললো, 'স্যারদের বয়ে গেছে তোর লেখা চেয়ে নিয়ে ছাপতে।'

আমি বললাম, 'দেখা যাবে।'

কথাটা জাঁক করে বললাম বটে, চেয়ে কারো লেখা ছাপানোর নিয়ম ছিলো না আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে। যাদের ইচ্ছা হতো তারা হয় ব্রাদার হোবার্ট নয়তো বাংলার যে স্যার ম্যাগাজিন সম্পাদনার দায়িত্বে থাকতেন তাঁদের কাছে লেখা জমা দিতো। স্যারদের পছন্দ হলে সে লেখা ছাপা হতো।

আমি অপেক্ষা করছি কবে স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য আমার লেখা চাওয়া হবে, কবে

ছাপার হরফে নিজের নাম দেখতে পাবো—তার জন্য। লেখা আর কেউ চায় না। এদিকে প্রায় প্রত্যেক বছর ইউনুসের লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হতে লাগলো।

অবশেষে সেই প্রত্যাশিত দিনটি এলো। ক্লাস নাইনে ওঠার পর ব্রাদার হোবার্ট একদিন বললেন, 'তুমি এইবার স্কুল ম্যাগাজিনে একটা গল্প দিবা।'

শুনে রীতিমতো রোমাঞ্চিত হলাম। কিভাবে যেন ব্রাদার জানতে পেরেছিলেন আমি ভালো বাংলা লিখতে পারি। ক্লাসে জমিয়ে গল্প বলতে পারি। এ থেকে ব্রাদারে ধারণা হয়েছিলো ইচ্ছা করলে আমি লিখতেও পারি।

সেবার ম্যাগাজিনের বাংলা অংশ দেখার দায়িত্ব ছিলো নলিনী স্যারের ওপর। সাহা স্যার ছিলেন তাঁর সহকারী। সাহা স্যার আমাকে কেন যেন পছন্দ করতেন না। ব্রাদার হোবার্টকে বললাম, 'লিখলে কী হবে। সাহা স্যার আমার লেখা ছাপবেন না।'

আমার আশঙ্কার কথা ব্রাদার হেসে উড়িয়ে দিলেন—'তুমি আমারে লেখা দিবা, আমি ছাপুম'। এর পর হুঙ্কার ছাড়লেন—'ডরাস ক্যান?'

স্কুল ম্যাগাজিনের লেখা মানে পুতু পুতু খোকা খোকা গল্প, গতবাঁধা উপদেশ আমার একটুও ভালো লাগতো না। ব্রাদারকে বললাম, 'আমার লেখা একটু অন্য রকমের হবে। একেবারে ছোটদের জন্য আমি লিখতে পারবো না।'

ব্রাদার বললেন, 'সাত দিনের মইদ্যে লেখা চাই।'

কিছুদিন আগে ছোড়দি কাউকে না জানিয়ে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করাতে বাড়িতে খুব অশান্তি হয়েছিলো। জেঠিমা, বড়দা, বড়দি এরা সবাই ঘরের দরজা বন্ধ করে ছোড়দিকে এমন সব কথা বলেছিলেন, আড়াল থেকে শুনে ভারি খারাপ লেগেছিলো। ছোড়দির বিয়ের ঘটনার সঙ্গে কিছু কল্পনার মিশেল দিয়ে একটা গল্প লিখে ব্রাদারকে দিয়ে এলাম। নাম মনে নেই, তবে বিষয়টা যে আদৌ ছোটদের উপযোগী ছিলো না, সেটা মনে আছে।

ম্যাগাজিন ছাপা হয়ে বেরোনোর পর টিচারদের মধ্যে মহা হইচই। বড়দের জন্য লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে কেন? নলিনী স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বেশি পেকে গেছো মনে হচ্ছে! কান দুটো মাথা থেকে খুলে নিলে কেমন হয়?'

প্রচন্ড রেগেছিলেন সাহা স্যার। পরে ব্রাদার হোবার্টের কাছে শুনেছি ওঁদের না জানিয়ে এরকম একটা বাজে গল্প কেন ম্যাগাজিনে ছাপলেন এ নিয়ে ব্রাদারকে তিনি সরাসরি জেরা করেছিলেন। ব্রাদার প্রথমে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী হেসে বলেছেন, 'আমার কাছে তো গল্পটা খারাপ মনে হয় নাই।' ব্রাদারের হাসি দেখে সাহা স্যার রেগে গেলেন—'স্কুলের ছেলেদের এইসব লেখা পড়তে দেয়া যায় না।'

'কেন যাইবে না?' ব্রাদার চোখ মটকে বললেন, 'স্কুলের লাইব্রেরির অর্ধেক বই তাইলে ফালাইয়া দিতে হইব।'

এরপর স্যার আরও রেগে গেলেন। আরও শক্ত শক্ত কথা বলে ব্রাদারের সমালোচনা করলেন। ব্রাদারও রাগলেন। সাহা স্যারকে বললেন তিনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

দারুণ জেদী ছিলেন আমাদের এই তরুণ টিচার। ব্রাদারের কথায় রেগে মেগে তিনি চাকরি থেকে রিজাইন দিলেন। তখন আমরা এর কিছুই জানতাম না।

পরে ব্রাদারের কাছে সব শুনে মনে ভারি কষ্ট হয়েছিলো। আমার জন্য একজন টিচারকে স্কুল থেকে চলে যেতে হয়েছে এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। ততদিনে আমি ছোটদের জন্য, ছোটদের পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে গেছি। ব্রাদারকে বললাম, 'আগে জানলে ওরকম লেখা আমি কখনও লিখতাম না।'

ব্রাদার গম্ভীর হয়ে গেলেন। এরপর 'লুক শ্যারিয়ার'— বলে খাঁটি আমেরিকান ইংরেজিতে যা বললেন তার সারবস্তু হচ্ছে— তুমি যদি বড় লেখক হতে চাও মনে রাখবে, তুমি যত ভালো লেখো না কেন সমালোচনা হবেই। সমালোচনার ভয়ে যারা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, তাদের দিয়ে পৃথিবীর কোন ভালো কাজ হয় না।'

বড় লেখক হতে না পারলেও ব্রাদারের কথাগুলো ভুলি নি। ব্রাদার হোবার্ট স্কুলে আমাকে নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

কলেজে উঠে যে সব গল্প লিখেছি, তার প্রায় সবই স্কুলের কোনো না কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে। ঘন্টা বুড়ো পিটার আর দপ্তরি ধনাই থেকে শুরু করে নিখিল স্যার, নিকোলাস স্যার, শুভদারগুন স্যার, রহমতুল্লা স্যার, গাঙ্গুলী স্যার, ব্রাদার হোবার্ট, ব্রাদার ফিলিপ্স— এঁরা আমার গল্প উপন্যাসের চরিত্র হয়ে বার বার এসেছেন।

আমার লেখক হওয়ার পেছনে বাড়ির পরিবেশও বেশ কিছুটা দায়ী। মেজদা একজন বড় লেখক এটা তো ক্লাস টু-তে পড়ার সময়ই জানা হয়ে গিয়েছিলো। ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়ার সময় ক্লাসের সবাই জেনে গিয়েছিলো জহির রায়হান আমার ভাই। ততদিনে মেজদা ছবি বানানো আরম্ভ করেছেন, আরও নাম হয়েছে। আমাদের তিন ভাইয়ের ভেতর আমার প্রতি মেজদার একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব ছিলো। এর একটা কারণ মা আমাকে বেশি পছন্দ করতেন আর মেজদা ছিলেন মা'র দারুণ ভক্ত। আমাকে পছন্দ করতেন বলে আমার পোষাকী নাম 'শাহরিয়ার' মেজদাই রেখেছিলেন। ছোটবেলায় তিনি আমাকে ডাক নামে নয়, পোষাকী নাম ধরে ডাকতেন। তখন থেকেই আমি মেজদার মতো হতে চাইতাম।

কুমারটুলিতে আমরা যে পাড়ায় থাকতাম সে পাড়াটার দুর্নাম ছিলো। আমাদের বাড়িটা অবশ্য পাড়ার একেবারে বাইরে, ওয়াইজ ঘাটের সদর রাস্তার কাছে। আমাদের বাড়ির পেছনে ছিলো ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিস আর গলিতে ঢুকতে ডান পাশে স্টার সিনেমা হল। তখন ওটার নাম ছিলো মায়া সিনেমা। ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের ডান দিকে ছিলো বাইজীদের বাড়ি। অভিজাত বাইজী নয়, একেবারেই সস্তা। সন্ধ্যে হলে মুখে উৎকট রঙ, পাউডার লিপস্টিক মেখে ওরা দরজার সামনে বসে থাকতো। অনেক রাত পর্যন্ত ওদের বাড়িতে মাতালদের হল্লা, গান আর নাচের ঘুঙুরের শব্দ শোনা যেতো।

আমাদের সবার জন্য বারণ ছিলো ও বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন না যাই। সন্ধ্যের পর

আমাদের বাড়ির উত্তর দিকের সমস্ত জানালা বন্ধ থাকতো। তারপরও বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে ঝমঝম ঘুঙুরের শব্দ আর বোম্বাই ছবির হিট গান ভেসে আসতো। বাইজি বাড়ির মেয়েরা পুরুষালি গলায় গাইতো—'লেকে প্যাহ্‌লা প্যাহ্‌লা পেয়ার . . .', কিংবা 'পেয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া' জাতীয় গান।

ও বাড়ির একটা মেয়ে ছিলো, আমার বয়সী, পরিষ্কার জামাকাপড় পরতো, দেখতেও সুন্দর ছিলো। ওর নাম ছিলো পুষ্কন্নি। ক্লাস টু থ্রিতে পড়ার সময় ও চলে আসতো আমাদের বাড়িতে। বড়দির মেয়ে পাঁচ বছরের সিলভী ছাড়া আমাদের দলে কোনো মেয়ে ছিলো না, আর কেউ চাইতো কিনা জানি না, আমি চাইতাম পুষ্কন্নি আমাদের দলে থাকুক। একদিন আমাদের খাইরি বুয়া আবিষ্কার করে ফেললো পুষ্কন্নি কোন বাড়ির মেয়ে। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে বকাঝকা করে ওকে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলো।

পুষ্কন্নির এক দিদিমা ছিলো, খুনখুনে বুড়ি। ওদের বাড়ির রোয়াকের পাশে ছোট্ট একটা খুপরির মতো ছিলো। পুষ্কন্নির দিদিমা সেখানে বসে ভিক্ষা করতো। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি বুড়িটা ভিক্ষা চাইবার ভঙ্গিতে বসা, মরে কাঠ হয়ে আছে। কেন জানি না পুষ্কন্নিদের বাড়ির কেউ ওর ধারে কাছেও আসেনি। খবর পেয়ে ডোম এসে বুড়ির লাশটা তুলে নিয়ে গেলো। ছোটবেলায় দেখা মানুষের এই অসহায় আর মর্মান্তিক মৃত্যু আমাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলো। পুষ্কন্নির সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য সেই ক্লাস থ্রি-তে পড়তেই জানা হয়ে গিয়েছিলো। বলা বাহুল্য এ জানাটা মোটেই সুখের ছিলো না। পুষ্কন্নির দিদিমাকে নিয়ে কলেজে পড়ার সময় বড়দের জন্য একটা গল্প লিখেছিলাম।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় একদিন হঠাৎ বাবার কাছে শুনি রায়ট লেগেছে। কোথায় কোন কাশ্মীরের এক মসজিদে নবীর কয়েক গাছি চুল রাখা ছিলো, সেখান থেকে খানিকটা নাকি কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। ব্যস সেই অজুহাতে গুন্ডারা এখানকার নিরীহ হিন্দুদের ঘর বাড়ি লুটপাট করে তাদের ধরে ধরে মারতে লাগলো। সেদিন স্কুলে গিয়ে শুনি ক্লাস হবে না। স্কুল বন্ধ। আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষক ছিলেন হিন্দু। কম বয়সী কয়েকজন ছাড়া সবাই ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন। সেদিন দেখি গাঙ্গুলী স্যার, নলিনী স্যার, নিখিল স্যার—সবাই পায়জামা আর শার্ট পরে শুকনো মুখে স্কুলে ঘোরাফেরা করছেন। পাড়ার অনেকগুলো হিন্দু পরিবার হোস্টেল বিল্ডিং-এ আশ্রয় নিয়েছে।

বাবা সেদিন দুপুরের আগেই বাড়ি ফিরলেন। খুবই গম্ভীর এবং চিন্তিত। বাড়ি ফেরার একটু পরেই বেরিয়ে গেলেন পরিচিতদের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য। আমাদের বনমালী ধোপা ছিলো হিন্দু। গোয়ালা হিন্দু, চুলকাটার নাপিত হিন্দু। বনমালী রোজ বাড়িতে এসে কাপড় নিয়ে যেতো। কখনও ও নিজে আসতে না পারলে ওর বউ আসতো। গোয়ালাও রোজ আসতো। নাপিত আসতো মাসে একবার।

বিকেলে বাবা গোয়ালাকে আমাদের বাড়িতে এনে তুললেন। ওর নাম ছিলো

রাখহরি কিংবা থাকহরি। সবাই ডাকতো হরি গোয়ালা। থাকতো ফরাশগঞ্জের ওদিকে। বাবা পরে বলেছিলেন তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতা।

বাংলাবাজারের মোড় পেরিয়ে জুবিলী স্কুলের দিকে যেতেই বাবা রাস্তার ওপর দেখেন একটা লাশ পড়ে আছে। হরি গোয়ালার বাড়ি ছিলো টিনের। ওদের বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা মন্দির। বাবা যখন ওদের বাড়িতে ঢুকলেন তখন বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে মন্দিরের সামনে হাতজোড় করে বসেছিলো। গুন্ডারা যদি মারতে আসে সবাই একসঙ্গে মরবে। পাঁচ ছয়টা গরু নিয়ে ওদের পালাবার কোনো উপায় ছিলো না।

বাবাকে দেখে হরি গোয়ালা এসে ওঁর পা জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কাঁদলো—'বাবু, এসেছেন যখন আমার গরুগুলোকে বাঁচান।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোথায় যাবে?'

হরি বললো, 'আমাদের কপালে যা লেখা আছে তাই হবে। আপনি গরুগুলো নিয়ে যান।'

'তোমরা সবাই আমার সঙ্গে চলো।' এই বলে বাবা হরিদের বাড়ির সাত আটজন মানুষ আর গরুগুলোকে সঙ্গে এনে আমাদের নিচের তলায় ওঠালেন।

অগলী সাহেবরা তখন অন্য বাড়িতে উঠে গেছেন, নিচের তলাটা ফাঁকাই পড়েছিলো। হরি গোয়ালা সেবার প্রায় মাস খানেক আমাদের বাড়িতে ছিলো। যাবার সময় জোর করে বাবাকে ওর একটা গরু দিয়ে যাবে। বাবা কিছুতেই নেবেন না। শেষে ও বললো, গরু বিক্রি করে ও ইন্ডিয়া চলে যাবে। যদি কোনো কসাই'র হাতে পড়ে সেজন্য ও চাইছে ওর সবচেয়ে প্রিয় গরুটা বাবার কাছে থাক। শেষে বাবা একশ পঁচাত্তর টাকা দিয়ে কালীকে কিনে রাখলেন।

দেশী গরু ছিলো কালী, দু' বেলা দুধ দিতো বারো সের। হরি বলেছিলো ও নাকি ষোল সের পর্যন্ত দুধ দেয়। এত দুধ কে খাবে? কালীর দেখা শোনা করার জন্য একটা ছেলে রাখতে হলো। ঘরের জন্য দু'সের রেখে বাকি দুধ বিক্রি করে দেয়া হতো। সিনেমা হলের সামনেই ছিলো মিষ্টির দোকান। ওরা বাড়ি এসে দুধ নিয়ে যেতো। একাত্তরের যুদ্ধের সময় রাজাকাররা কালী আর ওর ছেলে লালিকে কেটে খেয়েছিলো।

সেবার বেশ কয়েকদিন স্কুল বন্ধ ছিলো। স্কুল খোলার পর প্রথম যখন ক্লাসে ঢুকলাম কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিলো। পেছনের বেঞ্চে কয়েকজন উত্তেজিত গলায় বলাবলি করছিলো ইন্ডিয়ায় নাকি অনেক মুসলমান মেরে ফেলেছে। '৬৪ সালের সেই দাঙ্গার পর আমাদের দু'জন হিন্দু সহপাঠী কলকাতা চলে গিয়েছিলো। রতনের সঙ্গে একাত্তরে কলকাতায় দেখা হয়েছিলো, মৃনালের সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। যারা ছিলো বহুদিন তাদের মুখে হাসি দেখিনি। এবারের বইমেলার জন্য 'আলোর পাখিরা' লেখার সময় বার বার তিরিশ বছর আগের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিলো। কলেজে ওঠার পর একটা গল্পও লিখেছিলাম '৬৪-এর দাঙ্গার ওপর। ওটার নাম ছিলো 'থেমে নেই।'

অবাধ্যতার বয়স

এইট থেকে নাইনে ওঠার সময় আমার ইচ্ছা ছিলো আর্টস পড়বো। কথাটা শোনা মাত্র ধমক লাগালো ভাইয়া। তখন অবশ্য আগের মতো মারধোর করতো না কিন্তু শাসনের লাগামে এতটুকু ঢিল পড়েনি।

বাবা একদিন নিয়ে গেলেন মেজো মামার বাসায়। লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম বলে মেজো মামা আমাকে পছন্দ করতেন। বিরাট বড়লোক, রাশভারি প্রকৃতির, তাঁকে আমরা সবাই সমীহ করতাম। যখন তিনি বড়লোক হননি— নবরায় লেনে আমাদের বাড়িতে থাকতেন। মা তাঁর ভাই বোনদের ভেতর মেজো মামা, মেজো খালা আর ছোট খালাকে বেশি পছন্দ করতেন।

মেজো মামাকে বাবা বললেন, 'ও তো সায়েন্স পড়তে চাইছে না, বলে আর্টস পড়বে। আপনি কী বলেন?'

মেজো মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আর্টস পড়ে কি করবে?'

বললাম, 'মেজদার মতো বাংলায় অনার্স পড়বো।'

'বাংলা পড়ে কোনো লাভ হবে না। চাকরি বাকরি পাবে না কোথাও। শেষে রিকশা চালাতে হবে।'

গুরুজনদের মুখের ওপর কথা বলা তখনও শিখি নি। চুপ করে থাকলাম। মেজো মামা বাবাকে বললেন, 'ও সায়েন্স পড়বে।'

আমাকে কিছু না বলে বড়দাকে কথাটা একইভাবে বললেন বাবা। মেজো মামার মতো রূঢ়ভাবে না হলেও বড়দাও মত দিলেন আমার সায়েন্স পড়া উচিৎ। ভালো ছেলেরা নাকি সবাই সায়েন্স পড়ে। সেদিন টের পেলাম ভালো ছেলে হতে হলে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম থাকে না।

বাধ্য হয়ে ক্লাস নাইনে উঠে সায়েন্স নিতে হলো। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বিজ্ঞান

নামের বিষয়টার ওপর। মনে মনে ঠিক করলাম বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ই পড়বো না। দরকার নেই ভালো ছেলে হয়ে। তারপরও নাইনে উঠে বিজ্ঞানের কিছু ক্লাস ভালো লাগতো। একটাই ছিলো কারণ। ক্লাসে যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো তারা সবাই সায়েন্স নিয়েছে। প্রথম পনেরো জনের ভেতর আলী আহসান ছাড়া সবাই ছিলো সায়েন্সে। সায়েন্সের বিষয়গুলোর ভেতর সবচেয়ে বিরক্তিকর মনে হতো ইলেকটিভ ম্যাথ–এর ক্লাস, ভালো লাগতো কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল। ফিজিক্স–এর প্র্যাকটিক্যাল ভালো লাগতো না। নাইনে উঠে ক্লাস ফাঁকি দেয়া শুরু করলাম। ফিজিক্স–এর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস না করে চলে যেতাম দুপুরের 'স্পেশাল শো'তে সিনেমা দেখার জন্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তখন ছাত্রদের খুশি করার জন্য সিনেমা হলে বাসে, ট্রেনে আর প্লেনে স্টুডেন্ট কনসেশন চালু করেছিলেন। 'স্পেশাল শো'–এর টিকেটের দাম এমনিতেই 'রেগুলার শো'–এর চেয়ে কম ছিলো। স্টুডেন্ট কনসেশনে সেটা অর্ধেক হয়ে যেতো। নিয়মিত 'স্পেশাল শো' দেখার জন্য সাত আট জনের একটা দলই হয়ে গিয়েছিলো।

তখন ভালো ভালো সব ছবি চলতো 'স্পেশাল শো'তে। জেরি লুইস, নরম্যান উইসড্যাম, লরেল হার্ডি, পিটার উস্তিনভ আর জেমস জাস্টিস রবার্টসনের অনেকগুলো হাসির ছবি 'স্পেশাল শো'তেই দেখেছিলাম। নাইনে ওঠার পর বলাকা সিনেমা চালু হলো 'বেনহুর' ছবি দিয়ে। গুলিস্তানে তখন চলছিলো ফেলিনির 'লা ডলচে ভিটা।' ব্রাদার হোবার্ট বললেন, 'একটা বালো ছবি চলতাসে বলাকায়। তোমরা দেখিও। খবরদার কইলাম, গুলিস্তানের কাসে যাইবা না। ওইখানে যেইটা চলতাসে ওইটা খারাপ ছবি।'

ফেলিনির ছবি বোঝার বয়স সেটা ছিলো না। ব্রাদার যদি বারণ না করতেন তাহলে হয়তো আদৌ দেখা হতো না। ব্রাদারের বারণ শুনে আমরা ক্লাস পালানো কয়জন 'বেনহুর' দেখার আগে 'লা ডলচে ভিটা' দেখলাম এবং পুরো টাকাটা গচ্চা যাওয়ার জন্য বিরক্ত হলাম। অবশ্য 'বেনহুর' দেখতে গিয়ে সে রাগ মিটে গিয়েছিলো। সেই প্রথম স্টেরিওফনিক সাউন্ড সিস্টেমে ছবি দেখলাম। যীশুকে যখন ক্রুসে ঝোলানো হলো তখন বাজ পড়ার শব্দটা স্টেরিওতে এমন বিকট শুনিয়েছিলো যে বুক কেঁপে উঠেছিলো।

বিজ্ঞান পড়বো না বলে ক্লাসের বইয়ের চেয়ে গল্পের বই পড়ার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেলো। স্কুল লাইব্রেরির সব বই শেষ করে শুরু করলাম বই কেনা। ক্লাস সিক্স–এ বৃত্তি পেয়ে সে টাকা বাবাকে দিতাম। ক্লাস এইটের বৃত্তির টাকা বই কিনে ওড়াতাম। মাসে পনেরো টাকা বৃত্তি পেতাম। একদিনেই পনেরো টাকার বই কিনে ফেলতাম।

বাংলাবাজারে মাওলা ব্রাদার্স ছিলো বইপাড়ার অভিজাত দোকান। কাচের শোকেসে থরে থরে সাজানো থাকতো কলকাতার সব মনকাড়া মলাটের বই। হাতে টাকা না থাকলেও শুধু বইয়ের মলাট দেখার জন্য বাংলাবাজারে ঘুরতে যেতাম। ঘুরতে ঘুরতে একদিন আবিষ্কার করলাম পুরোনো বইয়ের দোকান। অর্ধেকেরও কম দামে পাওয়া যেতো ভালো ভালো গল্পের বই। দেব সাহিত্য কুটিরের ঢাউস মোটা পুজো

বার্ষিকী নতুন যেটার দাম চার টাকা ছিলো, পুরোনো বইয়ের দোকানে সেটার দাম দেড় টাকা। 'আলালের ঘরের দুলাল' কিনেছিলাম তিন আনা দিয়ে। ওটার অবশ্য মলাট ছিলো না। ছোটদের পড়তে দেখলে বড়রা রাগ করে এমন বইও কিনতাম পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে। বাড়িতে বাবা বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র পড়তে বারণ করতেন না, কিন্তু ফাল্গুনী, নীহার রঞ্জন, বিমল মিত্র পড়তে দেখলে বিরক্ত হতেন। চীনা লেখক লাও চাও-এর 'রিকশাওয়ালা' বাড়িতে ছিলো। একদিন ওটা পড়তে দেখে ভাইয়া কান মলে দিয়েছিলো।

অবাধ্যতা শুধু বড়দের বই পড়া আর লুকিয়ে সিনেমা দেখার ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিলো না। যা কিছু বারণ ছিলো সবই করা হতো। রাস্তার পাশে বিক্রি করা ফেরিওয়ালাদের মাটির সানকিতে রাখা আচার খাওয়া নিষেধ ছিলো। খোলা যে কোনো খাবারই নিষিদ্ধ ছিলো। নিচের ক্লাসে থাকতে ভয় ছিলো যদি ভাইয়া দেখে ফেলে। নাইন টেন-এ ওঠার পর ভাইয়ার ভয় যখন কেটে গেলো। তখন এসব জিনিস অম্লান বদনে খেতাম। নিষিদ্ধ খাবার মাত্রেই দারুন উপাদেয় ছিলো।

তবে যা কিছু নিষিদ্ধ সবই যে করতে ভালো লাগতো তাও নয়। ক্লাস নাইনের পিকনিকে জয়দেবপুর না শালনা গিয়েছিলাম মনে নেই— সাইফুর, শংকর, মাহবুব আর রফিকের পাল্লায় পড়ে সিগারেট খেয়েছিলাম। সাইফুররা আগে থেকেই সিগারেট খেতো। নিচের ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চার যারা ইনফ্যান্ট ওয়ান থেকে আমাদের স্কুলে পড়তো তারা কেন জানি না ভালো ছেলে বলে আমাকে অবজ্ঞা করতো না। বরং আমি যাতে ভালো থাকি সে রকম চেষ্টা করতো। নিজেরা যে সে অর্থে 'ভালো' নয় এ ব্যাপারেও তারা সচেতন ছিলো। কখনও, হয়তো ওরা নিজেরা নিজেদের ভেতরে খারাপ কথা আলোচনা করছে— আমি সেখানে গেলে ওরা বিব্রত বোধ করতো, বলতো 'শাহরিয়ারের সামনে এসব কথা বোলো না।'

ভালো ছেলে হতে গেলে নিচের ক্লাসে হীরালাল স্যার যেমন বলতেন—'কু-কথা বলবে না, কু-জিনিস দেখবে না, কু-কথা শুনবে না,' আমাদের ছিলো সেই দশা। সেভেন এইটে থাকতেই যাদের মুখে গোঁফের রেখা গজিয়েছিলো, বাংলা বাজার গার্লস স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারাটাকে দারুণ সাহসের ব্যাপার মনে করতো, আমার প্রতি ওদের আচরণ ছিলো যথেষ্ট সদয় এবং সম্ভ্রমপূর্ণ। প্রায় শুনতে হতো— 'তোরা ভালো ছেলে, তোদের এসব করা মানায় না।'

ফাইভ সিক্সে যে সব নতুন ছেলে ভর্তি হতো, তাদের ভেতর যারা ব্যাক বেঞ্চার ছিলো, তারা এসব নিয়ম মানতো না। ক্লাস এইটে মাহবুব একটা বই দিয়ে বলেছিলো, 'এই যে ভালো ছেলে, খুব তো বই পড়ো, এ বইটা টিফিনে পড়ে ফেরত দিও।'

মাহবুবের দেয়া বইটা টিফিনে পড়তে গিয়ে কানটান সব লাল হয়ে গেলো। সারা বই খারাপ খারাপ কথায় ভর্তি। বই শেষ না করেই মাহবুবকে ফেরত দিলাম। ও তখন ওর বন্ধুদের সঙ্গে চোখ টিপে মুচকি হেসেছিলো।

পিকনিকে মাহবুবদের দল সিগারেট খাচ্ছিলো। আমাকে দেখেও কেউ সিগারেট

আড়াল করলো না যেমনটি আগে করতো। বরং উল্টো বললো, 'কী হে ভালো ছেলে, এক টান দিয়ে দেখবে নাকি।' আরেক জন বললো, 'ছিঃ ছিঃ এসব কী বলছিস, ওর চরিত্র নষ্ট যাবে।'

শুনে ভারি রাগ হলো। বললাম, 'সিগারেট খাওয়াটা বুঝি খুব বাহাদুরির কাজ।'

সাইফুর না কে যেন বললো, 'এই গুলা ওইলো মরদের কাম। মিন মিনা মাইগা মার্কাগো কাম না।'

'তোদের মরদগিরির দৌড় জানা আছে। দে সিগারেট। খেতে পারি কি না দ্যাখ।'

সস্তা দামের কাঁচি মার্কা না বক মার্কা সিগারেট খাচ্ছিলো ওরা। একটা ধরিয়ে টান দিতেই মাথা ঘুরে গেলো, বেদম কাশি উঠলো। ফারুক নাকি জহির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, শুনে মাহবুবদের সেকি বকাবকি। বেচরা মাহবুবও আমার ওই অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো। বার বার বলছিলো, 'সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গেলি কেন? আমরা কেউ ধোঁয়া গিলি নাকি।'

তাই বলছিলাম, নিষিদ্ধ বস্তু মাত্রেই উপাদেয় ছিলো না।

ক্লাস টেন-এ ওঠার পর আমার ঔদ্ধত্যের আরেক পরিচয় পেলেন আমার প্রিয় শিক্ষকরা। আমার মতো ভালো ছেলে এরকম একটা কাজ করতে পারে— তাঁরা খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে এ নিয়ে ব্রাদার হোবার্টের দুঃখের অন্ত ছিলো না।

ছুটির ঘন্টা বেজে গেছে, আমরা কজন ক্লাসে বসে গুলতানি মারছিলাম। ছিলো অনেকেই, ফারুখ, সালেহ, মাসুক, আনসারী, আনোয়ার, ইউসুফ, জহির, আনসারী আরও কে কে যেন। জহির আর আনসারী ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বিজি চৌধুরী স্যারকে নকল করে আঁক কষছিলো। ফারুখরা আলোচনা করছিলো ব্রাদার রোণাল্ডকে নিয়ে। বেশি দিন হয়নি, আমাদের স্কুলে এসেছেন, অল্প বয়স, সাড়ে ছফুট লম্বা, রাগী আমেরিকান যুবক। ব্রাদাররা বাংলা শিখতেন বান্দুরায়। তাঁর বোধহয় বান্দুরার অভিজ্ঞতা বেশি সুখের ছিলো না, বাংলা একেবারেই বলতে চাইতেন না। নিচের ক্লাসের এক ছেলেকে নাকি বলেছিলেন, বাংলা চামারের ভাষা। সেই ছেলে ক্লাস টেন-এর বড় ভাইদের কাছে নালিশ করেছে। বড় ভাই ফারুখরা তার কী বিহিত করবে এ নিয়ে আলোচনা করছিলো। আমরা ক'জন অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলছি। ক্লাস নাইন টেন-এ ওঠার পর অনেকের গলাই ভারি হয়ে গিয়েছিলো। উত্তেজনাকর আলোচনা করতে গিয়ে গলার স্কেলও উঁচুতে উঠেছিলো। এমন সময় স্যুইং ডোর-এর ওপর দিয়ে দেখা গেলো ব্রাদার রোণাল্ডের রাগী মুখ।

এর পর যে প্রলয়ঙ্কারী ঘটনা ঘটেছিলো সেটা নিয়ে তিন বছর পর 'কচি ও কাঁচা' পত্রিকায় একটা গল্প লিখেছিলাম। গল্পে আসল নাম আর কিছু তথ্য বাদ দিয়েছিলেন কচি ও কাঁচার সম্পাদক আমাদের প্রিয় দাদাভাই। বলেছিলেন, 'গল্প কি কেউ আসল নামে লেখে? মামলা টামলা হলে সামলাবে কে?'

তখন মামলার ভয়ে দাদাভাই'র প্রস্তাব মেনে নিতে হয়েছিলো। এখন বয়স হয়েছে। সে সব ভয় আর নেই। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার অভিযুক্ত হয়ে ঘুরছি, ওসব মামলাকে

ভয় করলে চলে না। আসল নামেই ঘটনাটা প্রকাশ করছি।

আনসারীই বোধ হয় প্রথম দেখেছিলো ব্রাদারকে। আমাদের হুশিয়ার করে দেয়ার জন্যে হাতের ডাস্টারটা ছুঁড়ে মারলো কোণার দিকে। তোবারক ভাবলো ওকেই বুঝি ছুঁড়ে মারা হয়েছে। সেও পাল্টা ছুঁড়তে যাবে— তক্ষুণি বুঝি বাজ পড়ালো ক্লাসের মধ্যে। ব্রাদার রোণাল্ড গর্জে উঠলেন, 'গেট আউট। অল অব ইউ গেট আউট।'

সারা ক্লাস তখন গাঙ্গুলী স্যারের ভাষায় 'পিন ড্রপ সাইলেন্ট।' একে একে সবাই সুড় সুড় করে উল্টো দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো। আমার মাথার বোধহয় শনি ভর করে ছিলো। বুঝতে পারছিলাম না ব্রাদারের এত রাগের কারণ কী ঘটেছে। ব্রাদার আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'গেট আউট অব দা ক্লাস!'

আমার বিস্ময়টা বেড়েই চলেছে। ক্লাশে তাকিয়ে দেখি সবাই বেরিয়ে গেছে। আমাকেই কি তা'হলে ব্রাদার যেতে বলছেন! ব্যাপারটা কী? স্যাণ্ডেল খুঁজে পরতে একটু দেরিই হয়ে গেলো। ঝড়ের বেগে ব্রাদার ক্লাসে ঢুকলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'ডি'ন্ট ইউ হিয়ার মি সোয়াইন?'

এবার মুখ তুলে তাকালাম। বিস্ময় আর রাগ দু'টো একসঙ্গে মিশে আমাকে মুহূর্তের জন্য ভুলিয়ে দিলো আমি যে তখনও ক্লাসেই আছি। ব্রাদারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হাউ সিলি! হোয়াট মেক্স ইউ এ্যাঙগ্রি!'

'হোয়াট!'

আবার যেন ক্লাশে বাজ পড়লো।

'ইউ . . . ইউ '

রাগের মাথায় কথা হারিয়ে ফেললেন ব্রাদার রোণাল্ড। ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আমাকে ছুঁড়ে দিলেন হল রুমের দিকে।

বাইরে দাঁড়ানো ছেলেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। রাগে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে বললাম, 'ইডিয়ট! হাই ডেয়ার ইউ কল মি সোয়াইন?'

এবার বাজ নয়, পাঁচশো রাউন্ডের একটা বোমা যেন ফাটলো হল রুম-এর ভেতর— 'হোয়াট!'

মনে হলো পুরো বাড়িটাই বুঝি ব্রাদারের চিৎকারে থর থর করে কেঁপে উঠেছে।

'ইউ কল মি ইডিয়ট?' এবারের ঘাড় ধরে আর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না। প্রায় শূন্যে ঝুলিয়ে, হেঁচড়ে নিয়ে এলেন টিচার্স রুমের ভেতর দিয়ে একেবারে হেড মাস্টারের অফিস রুমে।

ছুটি হয়ে গেলেও প্রায় টিচারই বাড়ি যান নি। টিচার্সরুমে বসে গল্প করছিলেন। সবাই ছুটে এলেন। পিডি কষ্টা স্যারের বিস্ময়টা সবচেয়ে বেশি ছিলো। বললেন,'কি হয়েছে শাহরিয়ার?'

বললাম, 'ব্রাদার আমাকে অপমান করেছেন।'

স্যার আর কথা বাড়ালেন না। ব্রাদারের সঙ্গে যখন গণ্ডগোল, তখন কেউ আর সহানুভূতি দেখালেন না।

ব্রাদার রোণাল্ড আমাকে বসিয়ে রেখে বললেন, 'স্ট্যান্ড হিয়ার, ডোন্ট মুভ।'

ক্লাশের অন্য ছেলেদের কাছেও ব্যাপারটা ছিলো ধারণার বাইরে। ক্লাশের সবচেয়ে শান্ত ছেলেটাকে এভাবে রাগতে দেখে তারাও কেউ কাছে আসতে সাহস করলো না।

আধ ঘন্টার মত কেটে গেলো। ভাবছিলাম হেড মাষ্টারকে নিয়ে বুঝি ব্রাদার রোণাল্ড আসছেন। কিন্তু কারও দেখা নেই। হেডমাষ্টারের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে রাগে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিলো। শেষ আমাদের দপ্তরি ধনাইকে দিয়ে খবর পাঠালাম, হেডমাষ্টার অর্থাৎ ব্রাদার টমাস যেন এক্ষুণি একবার আসেন।

ব্রাদার টমাস এলেন। অফিস খুলে ভেতরে গিয়ে বসলেন। বললেন, 'কি হইয়াছে শ্যারিয়র?'

বললাম, 'ব্রাদার রোণাল্ড আমাকে মিছেমিছি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ক্লাস থেকে বের করেছেন। সবার সামনে আমাকে অপমান করেছেন।'

ব্রাদার টমাস বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হোয়াই? কেন?'

'জানি না কেন। তবে আমি এর কারণ জানতে চাই, কেন ব্রাদার রোণাল্ড আমার গায়ে হাত তুললেন। কেন টিচারদের সামনে ঘাড় ধরলেন, কেন তিনি সোয়াইন বললেন? কালই আমি এর জবাব চাই।'

এতগুলো কথা বলে আমি উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। ব্রাদার টমাস সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'বি ইযি মাই বয়। গো হোম এ্যাণ্ড সি মি টুমরো।'

ব্রাদারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। ছেলেরা সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করলো, 'কি বললেন ব্রাদার?'

বললাম সব। ফারুখ এবার আস্তে আস্তে বললো, 'ব্রাদার যদি কিছু না করেন তাহলে তুই কী করবি?'

শান্তভাবেই ওকে বললাম, 'তাহলে স্কুল ছেড়ে দেবো।'

'এ কেমনতরো পাগলামি!' সবাই গুঞ্জন করে উঠলো, 'স্কুল কেন ছাড়বি?'

'এ ছাড়া অন্য কোনো পথ আমি দেখছি না।'

ওরা সমস্বরে প্রতিবাদ জানালো। বললো, 'তুই একা কেন প্রতিবাদ করবি? যা করার আমরা সবাই একসঙ্গে করবো।'

'কি ভাবে?'

'কাল থেকে আমরা ক্লাস করবো না।'

'তা কী করে হয়!' মনে মনে খুশি হলেও বাইরে আপত্তি জানাই—'টেস্ট পরীক্ষা সামনে, একার জন্যে তোরা কেন সবাই ভুগবি?'

ফারুখ বললো, 'না, ব্রাদার রোণাল্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ও কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। ভুলে যাস কেন ও বাংলাকে কি বলেছে? এর প্রতিবাদ জানানোর এমন সুযোগ আর আসবে না।'

ঠিক হলো কাল থেকে টেন-এর ছাত্ররা ক্লাস করবে না।

পরদিন সবাই এলো স্কুলে। যথারীতি ঘন্টাও বাজলো। কিন্তু টেন-এর ছাত্ররা মাঠে

দাঁড়িয়ে রইলো।

আমাদের সেন্ট গ্রেগরির স্কুলের কড়া ডিসিপ্লিনের ভেতর এ ধরনের নিয়মভঙ্গ স্কুল-জন্মের গত আশি বছরে কেউ কোনো দিন দেখেনি। ক্লাশ শুরু হলো, কিন্তু আমরা ক্রিকেট খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন ব্রাদার টমাস। বললেন 'তোমরা কি কেউ ক্লাসে যাইবে না?'

মৃদু গুঞ্জন উঠলো। সবাই বলল, 'না'।

অপমানে ব্রাদার টমাসের টকটকে মুখ থেকে বুঝি রক্ত ছিটকে বেরিয়ে আসবে। ঠাণ্ডা গলাতেই বললেন, 'শ্যারিয়র! হোয়াট এ্যাবাউট ইউ?'

আমি চুপ করে রইলাম। ব্রাদার টমাস বললেন, 'ইজ ইট ট্রু শ্যারিয়র? তুমি ব্রাদারকে ইডিয়ট বলিয়াছ? ইজ ইট ট্রু?'

ওরা সবাই এক সঙ্গে বললো, 'মিথ্যে কথা, ও কখনও বলেনি!'

ব্রাদার টমাসের গলা একধাপ ওপরে উঠলো—'ইউ বয়েয! বি কোয়ায়েট! আই অ্যাম নট আস্কিং ইউ। শ্যারিয়র, ইয ইট ট্রু?'

একবার ওদের সবার মুখের দিকে চাইলাম। মাথা নিচু করে বললাম 'নো'।

'নো!' ব্রাদার একটা ধাক্কা খেলেন যেন। পরে বিড়বিড় করে বললেন, 'হি শুডন্ট টেল এ লাই!'

তারপর ব্রাদার আস্তে করে বললেন, 'ওয়েল বয়েয। এখন তোমরা কি চাও?'

ফারুখ গলা তুলে বললো, 'ব্রাদার রোণাল্ডকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

আবার এক ঝলক রক্ত উঠে এলো ব্রাদার টমাসের মুখে। বললেন, 'ক্ষমা! ইউ মিন এ্যাপোলজি? হাউ ক্যান ইট বি পসিব্‌ল্?'

'অন্যায়টা ব্রাদারের। ওর গায়ে তিনি হাতে তুলেছেন। ক্ষমা তাঁকে চাইতেই হবে।' গলায় জোর দিয়ে বললো সালেহ।

ব্রাদার টমাস অবাক হয়ে গেলেন ছেলেদের এ ধরনের দুঃসাহস দেখে। আপোষের সুরে বললেন, 'লুক বয়েজ! তিনি তোমাদের শিক্ষক। তিনি কি করিয়া ক্ষমা চাইবেন তোমাদের নিকট?'

ফারুখ বললো, 'তিনি অন্যায় করেছেন।'

এমন সময় মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটে এলেন ব্রাদার রোণাল্ড। হাতে একগাদা ডিটেন স্লিপ। আমাকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, 'ইট ইজ ইউ সোয়াইন! ইউ শুড লিভ দ্যা স্কুল এ্যাটওয়ান্স!'

ডিটেন স্লিপগুলো এগিয়ে দিলেন—'ইউ মাস্ট সি মি আফটার স্কুল।'

ক্লাসে কেউ কোনো গুরুতর অন্যায় করলে 'ডিটেন স্লিপ' দেয়া হতো। যে স্লিপ পেতো স্কুল ছুটির পর ওকে একঘন্টা ডিটেনশন ক্লাসে বসে লিখতে হতো। স্কুল জীবনে এটাই আমার প্রথম ডিটেন স্লিপ পাওয়া।

হাত বাড়িয়ে স্লিপগুলো নিলাম। আমার বন্ধুদের দিকে একবার তাকালাম। তারপর

টুকরো টুকরো করে স্লিপগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কারণ সাতটা ডিটেন স্লিপ পেলে এমনিতেই স্কুল থেকে বের করে দেয়া হবে। তখন আমি ধরেই নিয়েছিলাম এ স্কুলে আমার আর পড়া হবে না।

ব্রাদার টমাস কথা বলার সময়ও পেলেন না। স্লিপগুলো ছিঁড়তেই ঠাণ্ডা কঠিন গলায় শুধু বললেন, 'ব্রাদার রোণাল্ড!'

ওই বলাটুকুই যথেষ্ট ছিলো। ব্রাদার রোণাল্ড গটগট করে চলে গেলেন মাঠের ঘাস মাড়িয়ে। এবার ব্রাদার টমাস আমাদের বললেন, 'আমি আমার স্কুলে কোনো গণ্ডগোল হইতে দিব না। ক্লাস না করিলে তোমরা স্কুল কম্পাউন্ডে থাকিতে পারিবে না। তোমার ক্লাসে যাও, নচেৎ বাহিরে যাও!'

পায়ে পায়ে সবাই স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। এবার? সবার মুখে এক প্রশ্ন, এবার আমরা কী করবো? আমি বললাম, 'চল সংবাদ অফিসে যাই। বড়দা আছেন ওখানে। তাঁরাই বলে দেবেন কী করতে হবে।'

ওরা বললো, 'তাতে লাভ হবে না, তাঁরা ক্লাসে ফিরে যেতে বলবেন।'

ফারুখ বললো, 'চল জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের জানাইগে। ওখানে আমাদের স্কুলের পুরোনো ছাত্র অনেকে পড়েন। যা করার তাঁরাই করবেন।'

ওর কথা সবাই মেনে নিলো। জগন্নাথ কলেজে গিয়ে ওখানকার আলী রেজা ভাইকে সব বললাম। আলী রেজা ভাই তখন সেখানকার জাঁদরেল ছাত্র নেতা। বাংলা ভাষা সম্পর্কে অমন বলেছেন শুনে তিনি ক্ষেপে গেলেন। এক গাদা ছেলে ডেকে বললেন, 'চল আমরা এক্ষুণি গিয়ে দেখি।'

মিছিল করে ওরাই আগে আগে ঢুকলেন স্কুলে। ছুটে এলেন ব্রাদার টমাস। এটা বোধহয় তাঁর ধারণার বাইরে ছিলো। বললেন, 'হোয়াট্‌স্ রং? হু আর ইউ? হোয়াই ইউ আর হিয়ার?'

প্রথমেই ব্রাদার যে জবাবটা পেলেন, সেটা আলী রেজা ভাইয়ের গলা—'বাংলায় কথা বলুন।'

ব্রাদার একটু থমকে গেলেন। একটু হেসে বললেন, 'ও-কে। আমি ভালো বাংলা জানি না। তবে তোমরা এইখানে কেন আসিয়াছ?'

আলী রেজা ভাই আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলেকে ব্রাদার রোণাল্ড অপমান করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে গালি দিয়েছেন। এর কারণ জানতে চাই।'

ব্রাদার টমাস একবার আমার দিকে চাইলেন। মাথা নিচু করে রইলাম। ব্রাদার বললেন, 'এখন তোমরা কী চাও?'

আলী ভাই বললেন সেই একই কথা—'সে জন্যে তাঁকে মাপ চাইতে হবে।'

ইতিমধ্যে আমাদের টিচারদের অনেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। উপরে তাকিয়ে দেখি দোতালার ছাদে ব্রাদার রোণাল্ড।

পিডি কস্টা স্যার আমাকে ডেকে বারবার অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'এ কি করে হয় শাহরিয়ার? তোমাকে আমরা ভালো ছেলে বলেই জানি। তুমি এ কি করছো?

ব্রাদার কি করে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবেন? এ কেমন করে হয়!'

'চাইতেই হবে!' আলী রেজা ভাই কানের কাছে গর্জে উঠলেন—'তাঁর উচিৎ প্রত্যেক বাঙালীর কাছে গিয়ে মাপ চাওয়া। তাঁর কোনো অধিকার নেই আমাদের ভাষাকে অপমান করার।'

সবার গলাতেই প্রতিধ্বনিত হলো এই কথাগুলো। সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। খারাপ লাগছে আমার। রাগে-অপমানে লাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রাদার টামাস। পিডি কস্টা স্যার ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। মনে হলো একবার বলি, আলী ভাই আপনারা ফিরে যান। আমি তাঁকে ক্ষমা করেছি। তাছাড়া আমিও ব্রাদার রোণাল্ডকে ইডিয়ট বলেছিলাম। তাঁর জন্যে ব্রাদার টমাসের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। পরে ভাবলাম, এখন একথা বললে সবার হাসির পাত্র হবো।

ওরা সবাই গরম হতে লাগলো। আলী রেজা ভাই বললেন, 'কই, তিনি কই? তাঁকে ডেকে আনুন।'

ব্রাদার ধনাইকে ইশারা করলেন। বুড়ো ধনাই ছুটলো ব্রাদার রোণাল্ডকে ডাকতে। ব্রাদার টামাস বললেন, 'শ্যারিয়র! তুমি ব্রাদারকে ইডিয়ট বল নাই?'

ছেলেরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'না'।

ব্রাদার বললেন, 'ব্রাদাররা কখনো মিথ্যে বলেন না।'

আমি চুপ করে রইলাম। ভিড়ের ভেতর থেকে কলেজের ছাত্রদের একজন বললো, 'আহা আমার যুধিষ্ঠির রে!'

ব্রাদার টমাসের মুখ আর এক দফা লাল হলো। ব্রাদার রোণাল্ড এলেন। আর এলেন ব্রাদার হোবার্ট। কোথাও গিয়েছিলেন বোধহয় ব্রাদার হোবার্ট। কাছে এসে কাঁধে হাত রাখলেন। আমার দিকে একবার চাইলেন। তাঁর গভীর নীল চোখ দু'টোয় কোনো রাগ নেই, কোনো তিরস্কার নেই। শুধু সামান্য অভিযোগ—'আমি তোমার কাসে ইহা আশা করি নাই শ্যারিয়র।'

ইচ্ছা হলো মাটিতে মিশে যাই। ব্রাদার হোবার্টও একথা বললেন! চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ব্রাদার হোবার্ট আবার বললেন, 'ব্রাদার রোণাল্ড ক্ষমা সাইবার আগে তোমার ক্ষমা করা উসিত সিল শ্যারিয়র।'

এবার আমি আস্তে করে বললাম, 'আমার আর কোনো অভিযোগ নেই ব্রাদার হোবার্ট।'

ব্রাদার আরও আস্তে বললেন, 'ইহাদের কেন আনিয়াস?'

আলী রেজা ভাই ব্রাদার রোণাল্ডকে বললেন, 'আপনি কেন বাংলা ভাষাকে চামারের ভাষা বললেন? কেন এইছেলেকে অপমান করে কথা বলছেন? এ কারণ জানতে চাই।'

লাল হয়ে গেলেন ব্রাদার রোণাল্ড। বললেন, 'আই ডিডিন্ট সে সো!'

আবার আলী রেজা ভাই গর্জে উঠলেন, 'চুপ, বাংলায় বলুন! আপনি বলেছেন। আর সে জন্যে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে!'

'নো। আই ডোন্ট—'

'শাট, আপ!' ব্রাদার রোণাল্ডকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন আলী রেজা ভাই—'ক্ষমা না চাইলে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না আপনার কি হ'বে।'

ব্রাদার হোবার্ট শান্ত স্বরে বললেন, 'বি ইযি মাই চাইল্ড। অপমান বলিতে তোমরা কি বুঝিয়াস? অপমান কোনো দিন উপর হইতে আসে না। তোমাদের পিতা তোমাদের অপমান করিতে পারে না। তোমরা তোমাদের পিতাকে অপমান করিতে পারো। ব্রাদার রোণাল্ড তোমাদের পিতৃস্থানীয়। তাঁহাকে তোমরা অপমান করিও না।'

'আপনি কে?' বাধা দিয়ে আলী রেজা ভাই বললেন—'ও সব আমরা শুনতে চাই না। ওসব কথা ক্লাসে বলবেন। এখন একে ক্ষমা চাইতেই হবে।'

ব্রাদার হোবার্ট একটু থেমে বললেন, 'আমিও তোমাদের পিতার মত। ওয়েল বয়েয! তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ব্রাদার রোণাল্ড!'

ব্রাদার রোণাল্ড তাকালেন। নিচু গলায় ব্রাদার হোবার্ট বললেন 'ব্রাদার রোণাল্ড, ইউ শুড–।'

ব্রাদার রোণাল্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রাদার হোবার্ট এবার একটু কঠিন গলায় বললেন, 'ব্রাদার রোণাল্ড!'

ব্রাদার রোণাল্ড রাগ চেপে আলী রেজা ভাইকে বললেন, 'আমি কি বলিব?'

আলী রেজা ভাই বললেন, 'বলুন, আমি যা বলেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

থেমে থেমে ভাঙা বাংলায় ব্রাদার রোণাল্ড বললেন, 'আমি যদি তোমাকে অপমান করিয়া থাকি তবে সেই জঅনঅ আমি লজিত।'

আলী রেজা ভাই শক্ত গলায় বললেন, 'ও ভাবে নয়। যদি কোনো কথা নয়, আপনি সোজা ক্ষমা চান!'

পি ডি কস্টা স্যার অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'শাহরিয়ার কিছু বলো? তুমি চুপ করে কেন?'

ব্রাদার রোণাল্ড তাকালেন আমার দিকে। সাপের মত ঠাণ্ডা চাহুনি। বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কর।'

আলী রেজা ভাই বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি যান। আর হেড মাষ্টার স্যার, এ নিয়ে যদি এ ছেলেকে কোনো শাস্তি দেয়া হয় তাহলে এর ফল ভালো হবে না।'

আলী রেজা ভাইরা চলে গেলেন। ব্রাদার টমাস বললেন, 'তোমরা আইজ বাড়ি যাও। কাল হইতে ক্লাসে আসিবে।'

ক্লাসের ছেলেদের কেউ কেউ চলে গেলো। ব্রাদার হোবার্ট বললেন, 'শ্যারিয়র, আমার সঙ্গে আস।'

দোতলায় নিয়ে গেলেন আমাকে ব্রাদার হোবার্ট। একেবারে তাঁর নিজের ঘরে। বললেন 'বস।'

বসলাম। অনেকক্ষণ পর তিনি বললেন, 'ব্রাদার রোণাল্ডকে তোমার জন্য স্কুল

ছাড়িয়া যাইতে হইবে।'

ঢোক গিলে কোনো রকমে বললাম, 'কেন?'

ব্রাদার হোবার্ট বললেন, 'তোমার কথা যদি সইত্য হয়, তাহা হইলে ব্রাদার রোণাল্ড মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

তাঁর কথার কোনো জবাব দিলাম না। মাথা নিচু করে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে ব্রাদার হোবার্ট বললেন, 'ব্রাদাররা মিথ্যা বলেন না।'

গির্জার ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা বাজলো। ব্রাদার চুপচাপ বসে থেকে ঘন্টার মেঘমন্দ্র শব্দ শুনলেন। বললেন, 'আইজ তুমি অন্যায়কে সইয্য কর নাই। এই জিনিসটা আমি সারা জীবন তোমার মইধ্যে যেন দেখি।'

আরও কিছু কথা বললেন ব্রাদার হোবার্ট। তাঁর মুখের দিকে তাকাবার সাহস তখন আমি হারিয়ে ফেলেছি।

স্কুলে গেটের বাইরে ছেলেদের অনেকে তখন যুদ্ধ জয়ের আনন্দে মেতে উঠেছে। আমি দোতালার জানালা দিয়ে একবার দেখলাম। মনে হলো এ জয় আমার নয়।

নিচে নামতে ওরা সবাই আমাকে লুফে নিলো। বললো, 'আমাদের হিরো।'

আমি হাসলে চাইলাম। পারলাম না। আমার দু'চোখ তখন কান্নায় ভরে গেছে।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাবার হাত ধরে পা রেখেছিলাম সাধু গ্রেগরির স্কুলের আঙিনায়। স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি তাও তো কত বছর! জীবনে পাওয়ার কথা যদি বলি— কিছু কী কম পেয়েছি? মাঝে মাঝে ভাবি স্বর্গ থেকে কোনো দেবদূত এসে যদি আমার কোনো পূণ্যকর্মের জন্য বর দিতে চায়—কী চাইবো! মনের গভীরে অতি গোপন একটা ইচ্ছা আছে আমার। ভাবি আহা আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম পাঁচ বছর বয়সে, আবার যদি ফিরে পেতাম সাধু গ্রেগরির দিনগুলি!

সেই সব দিন শুধু স্বপ্নেই ফিরে পাওয়া যায়। আর এ কথাও সবাই জানে—স্বপ্নই বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে। সেই স্বপ্ন কখনও হয় ভবিষ্যতের, আবার কখনও হয় অতীতের।